সহায়ক তথ্য - ৭

ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কে

নেহরু ও চৌ এন-লাই পত্রাবলী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের
পক্ষ হইতে রমেন সেন কর্তৃক ৬৪/এ লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা ১৬ হইতে প্রকাশিত

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস,
১৭ হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশকের কথা

চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্বন্ধে ভারত ও চীন উভয় পক্ষের বক্তব্যের যে-সমস্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সবগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে। যাহাতে পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যগুলি একত্রিতভাবে সকলে পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই 'নেহরু-চৌ এন-লাই পত্রাবলী' প্রকাশ করা হইল। ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাস হইতে দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে যে পত্র বা নোট বিনিময় হইয়াছে তাহার সবগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; অধিকন্তু, সীমান্ত-সমস্যাকে মূল প্রশ্ন করিয়া পূর্বেও, অর্থাৎ ২১শে আগস্ট, ১৯৫৮ হইতে ২২শে মার্চ, ১৯৫৯ পর্যন্ত যে পত্র ও নোট বিনিময় হইয়াছে সেইগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ পাঠ সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত দুইটি শ্বেতপত্র (White Paper) ও কিছু সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

পুস্তিকাটি মুদ্রিত হইবার পরে উভয় পক্ষের আরও পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে সেইগুলি যোজনা করার ইচ্ছা রহিল।

প্রকাশক

পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীদপ্তর কর্তৃক ভারতস্থিত চীনের কাউন্সেলারকে প্রদত্ত পত্র

২১শে আগস্ট, ১৯৫৮

'সচিত্র চীন' (China Pictorial) পত্রিকার (৯৫ নং—জুলাই, ১৯৫৮) ২০-২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চীনের একটি মানচিত্রের প্রতি ভারত গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই মানচিত্রে মোটা বাদামি রেখা দ্বারা চীনের সীমানা নির্দেশিত হইয়াছে। মানচিত্রটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের সহিত চীনের সীমান্তের প্রশ্নের দিক দিয়া ইহাতে স্পষ্টই কতকগুলি অশুদ্ধি আছে। এই মানচিত্রে যে সীমানা দেখান হইয়াছে তাহাতে এইগুলিকে চীনের এলাকা হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে : (১) ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির পাঁচটি ডিভিসনের মধ্যে চারটি ডিভিসন; (২) উত্তর প্রদেশের উত্তরের কতকগুলি অঞ্চল; এবং (৩) পূর্ব লাদাকের অনেক অঞ্চল, যাহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অংশ। ইহাও মনে হয়, পূর্ব-ভুটানের সমগ্র তাশিগাং অঞ্চলটি ও উত্তর-পশ্চিম ভুটান এলাকার বেশ খানিকটা টুকরাও চীনা এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অতীতে একই ধরনের অশুদ্ধ মানচিত্র চীনে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৪-এর অক্টোবরে যখন মান্যবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীন ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষয়টি মান্যবর প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর গোচরীভূত করেন। সেই সময় মান্যবর চৌ এন-লাই এই জবাব দিয়াছিলেন যে, চলতি চীনা মানচিত্রগুলি পুরানো মানচিত্রের ভিত্তিতেই তৈরি এবং সেগুলিকে সংশোধন করিবার সময় চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের গভর্নমেন্ট পান নাই। এই বিবৃতির গুরুত্ব ভারত গভর্নমেন্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। অবশ্য, যেহেতু এখন এত বৎসর ধরিয়া চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের বর্তমান গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় আসীন আছেন এবং যেহেতু বারবার নূতন মানচিত্র চীনে প্রকাশিত হইতেছে, সেইহেতু ভারত গভর্নমেন্ট এই পরামর্শ দিতে চান যে, চীনা মানচিত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজটি আর দেরি করা উচিত নয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে, মানচিত্রটি এমন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা সরকারি ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে এবং সরকারি এজেন্সি দ্বারা যাহা বিতরণ করা হইয়াছে।

সুতরাং ভারত গভর্নমেন্ট পুনরায় এই বিষয়টির প্রতি চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে। ভারতের উত্তরদিকের সীমান্তটি ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে—১৯৫৬-এর তৃতীয় সংস্করণে—(স্কেল—১ ইঞ্চ = ৭৫ মাইল) স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। মানচিত্রটি সাধারণের ক্রয়ের জন্য পাওয়া যায়। ভারত গভর্নমেন্ট আনন্দের সহিত মানচিত্রটির একটি কপি চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের গভর্নমেন্টকে সরবরাহ করিবেন।

চীনের বৈদেশিক কার্যালয় কর্তৃক ভারতের কাউন্সেলারকে প্রদত্ত স্মারকলিপি

৩রা নভেম্বর, ১৯৫৮

'সচিত্র চীন' (China Pictorial)-এ (জুলাই সংখ্যা, ১৯৫৮) প্রকাশিত যে মানচিত্রের খসড়া নক্সায় "প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে চীনে রেলওয়ে ও ট্রাঙ্ক রাস্তার উন্নতি" দেখান হইয়াছে সেই মানচিত্র সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের স্মারকলিপির বিষয়ে চীন গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতে চাহেন :

চীনে সম্প্রতি যে সমস্ত মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিতে চীন এবং তাহার প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ চীন ও ভারতের মধ্যেও যে সীমারেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা করা হইয়াছে মুক্তি অর্জনের পূর্বে চীনে যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই ভিত্তিতে। মান্যবর প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তাঁহাকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। চীনের মানচিত্রে পুরানো মানচিত্র অনুসারে এই সীমান্তটি কেন অঙ্কিত হইল তাহার কারণ হিসাবে তখন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই মান্যবর প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে এই কথাই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, এখনও পর্যন্ত চীন গভর্নমেন্ট চীনের সীমানা সম্পর্কে জরিপকার্য বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সহিত পরামর্শ করেন নাই এবং নিজেদের দায়িত্বে চীন গভর্নমেন্ট এই সীমানায় কোনো পরিবর্তন করিবেন না। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই যে বিবৃতি দিয়াছিলেন সে বিবৃতির গুরুত্ব যে ভারত গভর্নমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন ইহা চীন গভর্নমেন্ট আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

চীন গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করেন যে, যথাসময়ে এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত পরামর্শ ও সীমান্ত অঞ্চলের জরিপ করিবার পর এই পরামর্শ ও অনুসন্ধানের ফলাফল অনুসারে চীনের সীমানা নূতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত করার বিষয় সিদ্ধান্ত করা হইবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হইতে চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮

নূতন দিল্লী
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮

মান্যবর, মিঃ চৌ এন-লাই
চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী
পিকিং

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

অনেকদিন পরে আপনাকে আমি এই চিঠি লিখিতেছি। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে চীনের জনগণের গভর্নমেন্ট যে অগ্রগতি সাধন করিয়াছে তাহা আমরা বিশেষ আগ্রহ ও প্রশংসার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। বিশেষত, প্রতি হেক্টর জমিতে এবং মোট উৎপাদন হিসাবেও চাউলের ফলনে যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হইয়াছে এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনেও যে বিপুল বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি।

চাউল-উৎপাদন ও ইস্পাত প্রস্তুতের বিষয়ে আমাদের দেশেও প্রায় একই রকম সমস্যার সম্মুখীন আমরা হইয়াছি বলিয়া স্বভাবতই আমরা চীন যাহা করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপকৃত হইতে চাই। এই উদ্দেশ্যে চীনে আমরা দুইটি প্রতিনিধিদল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। একটি দলে থাকিবেন কৃষক ও কৃষি-বিশেষজ্ঞরা এবং অপরটিতে থাকিবেন লোহা ও ইস্পাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা। এই প্রস্তাবে আপনার গভর্নমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া সম্মতি দিয়াছেন। অবশ্য এ কথা জানান হইয়াছে যে, ধান-বোনার ও চাষের পরবর্তী সময় হইতেছে পরের মার্চ-এপ্রিল মাস। যদি আপনার গভর্নমেন্টের পক্ষে অসুবিধাজনক না হয়, তবে আমাদের কৃষক ও কৃষি-বিশেষজ্ঞদের সেই সময়ই আমরা পাঠাইব আশা করিতেছি। কিন্তু আমাদের যে লোহা-ইস্পাত-বিশেষজ্ঞ দল, তাহাদের আমরা খুব শীঘ্রই চীনে পাঠাইব। আমি আশা করি, চীনে এখন যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা হইতে তাহারা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিবে এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা অনেক কিছু লাভ করিতে পারিব।

অবশ্য, এই চিঠি দ্বারা আপনাকে আমি বিরক্ত করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে। বিষয়টি হইতেছে ভারত ও চীনের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কে। আপনার মনে আছে, যখন চীনের তিব্বত অঞ্চল সম্পর্কে চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যা বিবেচিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে সীমান্তে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ও ছিল। অনেকগুলি গিরিপথের উল্লেখ করা হইয়াছিল, যেগুলি দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা দরকার। সেই সময় কোনো সীমান্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, এবং আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, আমাদের এই দুই দেশের

মধ্যে কোনো সীমান্ত-বিরোধ নাই। কার্যত আমরা ইহাই ভাবিয়াছিলাম যে, ১৯৫৪-এ সন্তোষজনকভাবে যে চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার দ্বারা আমাদের এই দুই দেশের মধ্যকার সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যারই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পরে, চীনে প্রকাশিত কয়েকটি মানচিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। যে মানচিত্রগুলি আমি দেখিয়াছি সেগুলি খুব নিখুঁত মানচিত্র নয়; তবু এ কথা বলা চলে যে, এই মানচিত্রগুলিতে খসড়াভাবে যে সীমান্ত অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত সীমান্তের সঙ্গে মেলে না। বস্তুত, কয়েকটি স্থলে এই সীমান্ত ভারতের এলাকার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যবোধ করিয়াছি; কেননা, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে কোনো সীমান্ত-বিরোধ আছে তাহা পূর্বে কখনও আমি জানিতাম না। যে চীন-ভারত আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯৫৪-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই বিরোধের কোনো উল্লেখ হয় নাই।

পরে, ১৯৫৪-এর অক্টোবরে আপনাদের দেশে যাইবার ও আপনার ও চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ও আনন্দ আমার হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয় এবং ইহা দেখিয়া আমার আনন্দ হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে মনোভাবের যথেষ্ট অভিন্নতা আছে এবং আমাদের সম্পর্কের হানি হইতে পারে এরূপ কোনো বিরোধ বা সমস্যা নাই। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি আপনার কাছে সংক্ষেপে এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, চীনে সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকটি এমন মানচিত্র আমি দেখিয়াছি যাহাতে দুই দেশের ভুল সীমান্তরেখা দেখান হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছিল যে ইহা হইয়াছে ভ্রান্তিবশত এবং সেই সময় আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, যেহেতু আমাদের সীমানাগুলি হইতেছে অতি স্পষ্ট এবং এগুলি বিতর্কের বিষয় নহে, সেইহেতু আমাদের অর্থাৎ ভারতের দিক হইতে এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নাই। আপনি আমাকে উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, এই মানচিত্রগুলি আসলে পুরানো মুক্তি-পূর্বকার মানচিত্রের পুনর্মুদ্রণ এবং এগুলি সংশোধন করিবার সময় আপনাদের ছিল না। আপনার গভর্নমেন্টের বহুবিধ এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ থাকার কারণে যে এই সংশোধন তখন পর্যন্ত করা হয় নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি। আমি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে অনতিবিলম্বে এই সীমান্তরেখার সংশোধন করা হইবে।

১৯৫৬-এর শেষদিকে ভারতে আপনি আগমন করিয়া আমাদের সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং অনেকদিন ধরিয়া আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার আনন্দ আমাদের হইয়াছিল। এই কয়েকদিনের একাংশ আপনি ব্যয় করিয়াছিলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করিয়া। দিল্লীতে এবং কয়েকটি জায়গা পরিদর্শনের সময়, বিশেষ করিয়া ভাকরা-নাঙ্গালে আমাদের বিরাট নদী-উপত্যকাটি পরিদর্শনের সময় আপনার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল এবং মানুষের মনে তখন আলোড়ন আনিয়াছিল এমন বহু আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইয়াছিল এবং এইসব বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। এই সব কথাবার্তার মধ্যে আপনি চীন-বর্মা সীমান্তের বিষয় প্রশ্ন তোলেন। পিকিং-এ উ-নূর সঙ্গে আপনার যে কথা হইয়াছিল তাহা আপনি আমাকে বলেন এবং

ইহাও বলেন যে, বর্মা-গভর্নমেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ের মীমাংসা করার আগ্রহ আপনার আছে। এই একই খবর আমি উ-নূর নিকট হইতেও পাই। তিনি আমাকে বলেন যে, উভয় দেশেরই পক্ষে সন্তোষজনকভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করার ইচ্ছা আপনার আছে। এই প্রসঙ্গেই আপনি আমার কাছে চীন-ভারত সীমানার কথা উল্লেখ করেন এবং বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইনের সম্বন্ধে। এই ম্যাকমোহন লাইন হইতেছে চীন-বর্মা সীমান্তের একাংশ ও ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্তের এক বড় অংশ লইয়া। আমার মনে পড়ে, আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই সীমান্তকে ম্যাকমোহন লাইন বলাটা আপনি সমর্থন করেন না এবং তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে আমিও ঐ নামটি পছন্দ করি না। কিন্তু উল্লেখ করার সুবিধার জন্য এই নামেই আমরা বলিয়া থাকি।

আপনি আমাকে তখন বলিয়াছিলেন যে, বর্মার সঙ্গে সীমানা হিসাবে এই ম্যাকমোহন লাইনকে আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং দূর অতীতে যাহাই হউক না কেন, চীন এবং ভারতের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ক্ষেত্রেও এই সীমান্তকেই স্বীকার করিয়া লইবার প্রস্তাব আপনি করিয়াছিলেন। আপনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে চীনের তিব্বত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আপনি চান এবং করার প্রস্তাবও আপনি করিয়াছিলেন।

আমাদের কথাবার্তার অব্যবহিত পরেই আমি ইহার একটি বিবরণী লিখিয়া ফেলি, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য ও গোপনীয় কাজের জন্য এই কথাবার্তার একটা রেকর্ড থাকে। এই বিবরণী হইতে একটি উদ্ধৃতি আমি দিতেছি :

"প্রধানমন্ত্রী চৌ ম্যাকমোহন লাইনের বিষয় উল্লেখ করেন এবং আবার বলেন যে তিনি আগে এ সম্পর্কে কোনো কথা শুনেন নাই; অবশ্য তদানীন্তন চীন গভর্নমেন্ট এ সম্পর্কে যাহা করার তাহা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই লাইন স্বীকার করেন নাই। বর্মার সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধের প্রসঙ্গে এই বিষয়টি তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি মনে করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই লাইনটি ন্যায়সঙ্গত নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেহেতু এটি একটি স্বীকৃত ঘটনা এবং যেহেতু চীন ও ভারত, বর্মা প্রভৃতি এৎসংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান, সেইহেতু চীন গভর্নমেন্টের মত এই যে, এই ম্যাকমোহন লাইনকে স্বীকার করা তাঁহাদের উচিত। অবশ্য, বিষয়টি সম্পর্কে এখনও তাঁহারা তিব্বত-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই। এই পরামর্শ তাঁহারা করিবেন।"

আমার মনে পড়ে, এই বিষয়টি লইয়া আপনার সহিত আমার অনেকক্ষণ ধরিয়াই আলোচনা হইয়াছিল। বিষয়টি আপনি বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, শুধুমাত্র কতকগুলি ছোটখাট সীমান্ত সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান এখনও হয় নাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, দুই গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা একত্র বসিয়া প্রচলিত কার্যব্যবস্থা ও প্রথা ও তাহার সহিত জলাশ্রয় (Water Shed) বিষয়টিকেও ভিত্তি করিয়া এই সমস্ত ছোটখাট প্রশ্নগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসা করা উচিত। একত্রভাবে বসার কাজটি বহুদিন বিলম্বিত হইয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন গভর্নমেন্টের একজন প্রতিনিধি দিল্লীতে আসেন এবং

ছোটখাট বিষয়গুলির একটি বিষয় লইয়া কিছুদিন ধরিয়া আলোচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টির সম্পর্কে কোনো মীমাংসায় পৌঁছান গেল না এবং স্থির হইল যে পরে আলোচনা চালাইয়া যাওয়া হইবে। এখন পর্যন্ত এই সমস্ত কথাবার্তার কোনো সন্তোষজনক ফল ফলে নাই বলিয়া আমি দুঃখিত। বিষয়টি ক্ষুদ্র এবং আমি চাহিয়াছিলাম যে, বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার দ্বারা আমাদের দুই গভর্নমেন্টের ও দুই দেশের পক্ষে হানিকর সমস্ত বিষয়গুলি দুরীভূত করা হউক। এই বিষয়ে আপনার কাছে চিঠি লিখিব এইরূপেই আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এত ক্ষুদ্র একটি বিষয় লইয়া আপনাকে কষ্ট না দিবার সিদ্ধান্তই আমি করিলাম।

কয়েক মাস পূর্বে 'সচিত্র চীন' (China Pictorial) পত্রিকায় প্রকাশিত চীনের একটি মানচিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আবার আকর্ষণ করা হইল। এই মানচিত্রে ভারতের সহিত চীনের সীমান্তের ইঙ্গিত আছে। এই মানচিত্রটিও খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কিত নহে। কিন্তু যে অস্পষ্ট সীমারেখাটি ইহাতে আছে, তাহাও আমাদের কাছে ভ্রান্তভাবে অঙ্কিত বলিয়া মনে হইয়াছে। এই সীমারেখাটি একেবারে ভারতীয় এলাকায় ভিতরে গিয়া ঢুকিয়াছে। আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির এক বিরাট অংশ এবং ভারতের অংশ হিসাবে এখনও খুব ভালভাবেই স্বীকৃত এবং বহু পূর্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল এবং যাহা আমাদের দেশের অন্য যে-কোনো অংশের মতই ভারত কর্তৃক প্রশাসিত এমন অন্যান্য অনেক অংশও চীনের এলাকার অংশ হিসাবে দেখান হইয়াছে। উত্তর-পূর্বদিকে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটানেরও অনেক অঞ্চল চীনের দিকে দেখান হইয়াছে। ম্যাকমোহন লাইন বলিয়া জ্ঞাত লাইনটি হইতে স্পষ্টই ভারতের দিকে অবস্থিত এমন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির একটি অংশকে এই মানচিত্রে চীনা এলাকার অংশ হিসাবে দেখান হইয়াছে।

এই মানচিত্র সম্বলিত পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে বিতরিত হইয়াছে এবং এ-বিষয়ে আমাদের পার্লামেন্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। আমি এই মর্মে জবাব দিই যে, এই মানচিত্রগুলি পুরানো মানচিত্রের পুনর্মুদ্রণ মাত্র এবং পরিস্থিতির প্রকৃত ঘটনা এগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই।

এই বৎসরই কিছুকাল পূর্বে এই মানচিত্রের প্রতি আপনার গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করি। আমাদের এই বক্তব্যের জবাব হিসাবে যে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয় তাহাতে আপনার গভর্নমেন্ট এই কথাই বলেন যে, চীনে সম্প্রতি-প্রকাশিত মানচিত্রগুলিতে চীন এবং ভারত সমেত প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যকার যে সীমানা দেখানো হইয়াছে, সে-সীমানা অঙ্কিত হইয়াছে মুক্তির পূর্বকার প্রকাশিত মানচিত্রের ভিত্তিতে। ইহা ছাড়াও বলা হইয়াছিল যে, এখনও পর্যন্ত চীন গভর্নমেন্ট চীন-সীমানার কোনো জরিপ করেন নাই বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সহিত কোনো পরামর্শ করেন নাই এবং শুধু নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী সীমানা সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন তাঁহারা করিবেন না।

এই জবাব পাইয়া আমি ঘাবড়াইয়া যাই; কেননা, আমি ভাবিয়াছিলাম, চীন ও ভারতের মধ্যে কোনো বড় রকমের সীমানা বিরোধ নাই। আমাদের দিক হইতে বিচার করিলে, এরূপ কোনো বিরোধ কখনও ছিল না এবং ১৯৫৪-এ আপনার সহিত আমার কথাবার্তার সময়ে এবং তাহার পরেও এ কথা জানাইয়াছিলাম। চার বৎসর পূর্বে এ কথা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, জাতীয় পুনর্গঠনের বড় বড় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকায়

চীন গভর্নমেন্ট পুরানো মানচিত্র সংশোধন করার সময় পান নাই। কিন্তু, চীনা জনগণের প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতালাভের নয় বৎসর পরেও এই ভুল মানচিত্র ক্রমাগত প্রকাশিত হইতে থাকাটা যে আমাদের পক্ষে এবং অন্যান্যদের পক্ষেও বিরক্তিকর হইতেছে, ইহা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন। ভারতের এই সব বড় বড় অংশ যে ভারতেরই, অন্য কাহারও নয়—এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং ঐ সব অংশগুলি সম্বন্ধে কোনো বিরোধ নাই। কি ধরনের জরিপ দ্বারা এই সমস্ত সুপরিজ্ঞাত ও নির্দিষ্ট সীমানাগুলির অদল-বদল হইতে পারে, তাহা তো আমি জানি না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে আমাদের অসুবিধাগুলি আপনি বুঝিবেন।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহসী হইয়াছি এই কারণেই যে, আমি অনুভব করি যে, আমাদের দেশ দুইটির মধ্যে গুরুতর মত-বিরোধের কোনো সম্ভাবনা থাকিলে তাহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা উচিত। এ বিষয় ভাবিয়া আমি উৎকণ্ঠিত যে—এবং আমি নিশ্চিত জানি, আপনিও উৎকণ্ঠিত—আমাদের বন্ধুত্বের দৃঢ় ভিত্তিটি শুধু বজায় রাখিতে হইবে তাহাই নহে, ইহাকে শক্তিশালীও করিতে হইবে।

আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও নববর্ষের জন্য সকল শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

আপনার আন্তরিক

(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট লিখিত চীনের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৯

পিকিং
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮-এর চিঠি আমি পাইয়াছি। রাষ্ট্রদূত পার্থসারথি মহাশয় ইহা আমাকে দিয়াছেন।

অর্থনৈতিক গঠনকার্যের দিক দিয়া আমাদের দেশ যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহাকে আপনি যে মর্যাদা দিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। একথা সত্য যে, সমগ্র চীন জনগণের যুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দেশ ১৯৫৮-এ শিল্প ও কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপারে অগ্রগতিসাধন করে এবং এই অগ্রগতিকে আমরা "সামনের দিকে এক বিরাট উল্লম্ফন" বলিয়া বর্ণনা করি। যাহাই হউক, যেহেতু অত্যন্ত দরিদ্র অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হইতে আমাদের শুরু করিতে হয়, সেইহেতু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান বিকাশের স্তর এখনও খুব নীচু। আরও অনেক বছর ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিলে তবেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চিত্রে আপেক্ষিকভাবে এক বড় পরিবর্তন করিতে পারিব।

আমাদের দেশের কৃষি এবং লোহা ও ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে জানিবার জন্য যে দুইটি প্রতিনিধিদল পাঠাইবার কথা ভারত গভর্নমেন্ট বলিয়াছেন তাহাকে আমাদের গভর্নমেন্ট আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাইতেছেন। এবং আমি যতদূর জানি, আমাদের বাঁধ ও সেচকার্য অনুশীলন করিবার জন্য অন্য একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই চীনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা আমাদের দেশে স্বাগত জানাইতেছি এবং আনন্দের সহিত আমরা তাঁহাদের সম্ভবমত সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিব। এই দুইটি ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজ্ঞতা কি তাহা তাঁহাদের কাছ হইতে জানিবার আশাও আমরা করি। বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলের এই প্রকার আদান-প্রদান এবং এই প্রকার অভিজ্ঞতার অন্তর্প্রবাহ নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের পক্ষে সাহায্যকর হইবে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরাও সর্বদাই বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছি এবং ইহার সাফল্য আমরা কামনা করি।

আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, গত বৎসরে চীন ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আরও বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। জাতি-সংঘের সাধারণ পরিষদের ১৩শ অধিবেশনে জাতি-সংঘের যোগ্য আসনে চীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার জন্য এই সুযোগে চীন গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে আমি ভারত গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাইওয়ান ও উপকূলবর্তী দ্বীপগুলির

প্রশ্নে আমাদের দেশের প্রতি ভারত গভর্নমেন্ট যে সমর্থন জানাইয়াছেন তাহার জন্যও আমরা ভারত গভর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আপনার পত্রের অনেকখানি জুড়িয়া আপনি চীন-ভারত সীমানার প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে এই প্রশ্নে ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব আগের চেয়ে ভাল করিয়া বুঝিতে আমাদের সাহায্য হইয়াছে। আমিও এখন জানাইব, এ বিষয়ে চীন গভর্নমেন্টের মতামত ও মনোভাব কি।

সর্বপ্রথমে, আমি বলিতে চাই যে, চীন-ভারত সীমানা কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্কিত হয় নাই। ইতিহাসের দিয়া দিয়া, চীনা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ও ভারত গভর্নমেন্টের মধ্যে চীন-ভারত সীমানা সম্বন্ধে কোনো সন্ধি বা চুক্তি কোনোদিন সম্পাদিত হয় নাই। প্রকৃত পরিস্থিতি কি তাহা বলিতে গেলে, সীমানা প্রশ্নে দুই পক্ষের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। চীন-ভারত সীমানার কতগুলি অঞ্চল কোন্ দিকে থাকিবে এই প্রশ্ন লইয়া গত কয়েক বৎসরে কূটনৈতিক বিভাগগুলির মাধ্যমে একাধিকবার চীনা পক্ষ ও ভারতীয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। সর্বসাম্প্রতিক বিরোধের বিষয়টি হইতেছে চীনের সিনকিয়াং-উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের একটি অঞ্চল সম্বন্ধে। এই অঞ্চলটি বরাবরই চীনা এক্তিয়ারের মধ্যে রহিয়াছে। এই অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবেই চীন গভর্নমেন্টের সীমান্তরক্ষীদের দ্বারা টহলদারী কাজ চালান হইতেছে। এবং ১৯৫৬-এ আমাদের দেশ যে সিনকিয়াং-তিব্বত সড়ক তৈরি করিয়াছে, সেই সড়কও এই অঞ্চল দিয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্ট দাবি করিতেছেন যে, এই অঞ্চলটি ভারতীয় এলাকা। এই সমস্ত হইতেই দেখা যায় যে, চীন ও ভারতের মধ্যে সীমানা-বিরোধ সত্যই রহিয়াছে।

এ কথা সত্য যে, ১৯৫৪-এ যখন চীনের তিব্বত অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াত সম্পর্কিত চুক্তির জন্য চীন পক্ষ ও ভারতীয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল, তখন সীমান্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, তখনও পর্যন্ত এই বিষয়ের মীমাংসার অবস্থাটি পরিপক্ক হয় নাই, এবং চীনের দিক হইতে বলিতে গেলে, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্নটি অনুধাবন করিবার সময় ছিল না। চীন গভর্নমেন্ট বরাবরই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন যে, সীমান্ত প্রশ্নটি থাকা সত্ত্বেও চীন-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশের কোনোই হানি হওয়া উচিত নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, অতীত হইতে চলিয়া আসিয়াছে যে প্রশ্নটি, উপযুক্ত প্রস্তুতির পর, বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীলের ভিত্তিতে, সেই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা নিশ্চয়ই করিতে পারা যাইবে। এই লক্ষ্য লইয়া চীন গভর্নমেন্ট এখন প্রস্তুতি করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

চীন-ভারত সীমান্ত সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতেছে তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইনের প্রশ্নটি। এ বিষয়টি লইয়া আমি মান্যবর আপনার সহিত এবং প্রধানমন্ত্রী উ-নুর সহিতও আলোচনা করিয়াছি। এখন আমি আবার চীন গভর্নমেন্টের মনোভাবটি বুঝাইয়া দিতে চাই। আপনি জানেন যে, 'ম্যাকমোহন লাইন'টি হইতেছে চীনের তিব্বত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের আক্রমণাত্মক নীতি হইতেই সঞ্জাত এবং ইহা চীনা জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণারই উদ্রেক করিয়াছে। আইনের দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহাকে আইনসম্মত বলা

যাইতে পারে না। আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, চীনের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কোনোদিনই ইহা মানিয়া লন নাই। যদিও এতৎসম্পর্কিত দলিলে চীনের তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিয়াছেন, তবু আসলে একতরফাভাবে অঙ্কিত এই লাইন সম্বন্ধে তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট। এবং আমিও আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে তিব্বত-কর্তৃপক্ষের এই অসন্তুষ্টির কথা জানাইয়াছি। অন্যদিকে, যে সমস্ত বিরাট ও উৎসাহজনক পরিবর্তন হইয়াছে সেগুলিকে অস্বীকার করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এই সীমারেখার সহিত সংশ্লিষ্ট ভারত ও বর্মা, এই দুই দেশ পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে এবং চীনের বন্ধু-রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। উপরে যে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া চীন গভর্নমেন্ট একদিকে ম্যাকমোহন লাইন সম্পর্কে কম-বেশি বাস্তব মনোভাব লওয়ার প্রয়োজন মনে করেন, অপর দিকে তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞতার সহিত কাজ করা ছাড়া উপায় নাই এবং বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে সময়ও দরকার। এই সমস্ত বিষয়ই একাধিকবার আপনাকে আমি জানাইয়াছি। যাহাই হউক, আমরা বিশ্বাস করি যে, চীন ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যখন আছে তখন সীমান্তরেখার এই অংশের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসাও অবশেষে হইতে পারে।

যেহেতু দুই দেশের সীমানাটি এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই এবং কিছু মতভেদ রহিয়াছে, ঠিক সেইহেতু দুই পক্ষের মানচিত্রে অঙ্কিত সীমারেখা দুইটির মধ্যে অসঙ্গতি থাকিতে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চীনা সীমানাকে যেভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা গত কয়েক দশক ধরিয়া এবং আরো বেশি পূর্ব হইতেও বলা যাইতে পারে, চীনা মানচিত্রসমূহে অঙ্কিত সীমানার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই করা হইয়াছে। আমরা এ কথা বলি না যে, এই সীমারেখার প্রত্যেকটি অংশই যথেষ্ট ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু কোনো জরিপ না করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনো পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত হইবে। তাহা ছাড়াও, এইরূপ পরিবর্তন করার অসুবিধাও আছে; কেননা, ইহাতে আমাদের জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির উদ্রেক হইবে এবং আমাদের গভর্নমেন্টের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ হইবে। বস্তুত, যেভাবে চীন-ভারত সীমানাটি, বিশেষত ইহার পশ্চিম অংশটি ভারতে প্রকাশিত মানচিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের জনগণও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা আমাদের গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছে, যেন গভর্নমেন্ট এই বিষয়টি লইয়া ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তাহা করি নাই, চীন-ভারত সীমানার প্রকৃত পরিস্থিতি কি তাহাই তাহাদের বুঝাইয়া বলিয়াছি। সীমানা প্রশ্নের মীনাংসার সঙ্গে সঙ্গে—আমাদের গভর্নমেন্ট বার বার বলিয়াছেন যে এই মীমাংসার জন্য দরকার জরিপ ও পারস্পরিক পরামর্শ—মানচিত্রে সীমানা অঙ্কনের সমস্যাটির সমাধানও হইয়া যাইবে।

সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে চীন এবং ভারতের মধ্যে ছোটখাট কতকগুলি সীমান্ত-ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সীমানা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনাগুলি এড়াইয়া যাওয়া বোধহয় শক্ত। সীমানাটি আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত হওয়ার পূর্বেও এই

ধরনের ঘটনা যতদূর সম্ভব এড়াইবার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট ভারত গভর্নমেন্টের কাছে এই প্রস্তাব করিতে চাহে যে, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে উভয়পক্ষই সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখুন, অর্থাৎ, প্রত্যেক পক্ষই বর্তমানে তার নিজের এক্তিয়ারে যে সীমান্ত অঞ্চল আছে সেইখানেই থাকুন এবং তাহার বাহিরে যাইবেন না। দুই পক্ষের মধ্যকার মত-বিরোধটির মীমাংসার জন্য স্বভাবতই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করা যাইতে পারে, যেমন আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল উযে (হোতি) প্রশ্নে। উযে সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার বিষয়ে ইহাই বলিতে হয় যে, এই প্রশ্নে যে কোনো মতৈক্যে এখনও পৌঁছান যায় নাই তাহার জন্য আমরাও বিশেষভাবে দুঃখিত। পূর্বে আমরা ইহাই ভাবিয়াছিলাম যে, আলাপ-আলোচনার এবং সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছান কঠিন হইবে না। আমাদের এখনও বিশ্বাস আছে যে, আমাদের উভয়পক্ষ চেষ্টা চালাইয়া গেলে এই ক্ষুদ্র বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে। চীন গভর্নমেন্ট আশা করেন যে, দুই পক্ষের মধ্যকার সীমানার বর্তমান অবস্থাটি সাময়িকভাবে বজায় রাখার উপরোক্ত প্রস্তাবটি ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

চীন-ভারত মৈত্রীকে চীন গভর্নমেন্ট ও চীন জনগণ যে কত বেশি মূল্য দেয় সে বিষয়ে পুনর্ঘোষণা করার প্রয়োজন আমি মনে করি না। আমাদের দুই দেশের মধ্যকার কোনো মত-বিরোধ যে এই মৈত্রীকে নষ্ট করিবে—তাহা আমরা হইতে দিব না এবং আমরা বিশ্বাস করি, ভারতও এই মনোভাবেরই অংশীদার। আমি আশা করি, চীন-ভারত সীমানা প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের গভর্নমেন্টের মনোভাবকে আরো ভাল করিয়া বুঝিতে এই চিঠি আপনাকে সাহায্য করিবে।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ—

স্বাঃ চৌ এন-লাই
চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী

চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট লিখিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

২২শে মার্চ, ১৯৫৯

নূতন দিল্লী
২২শে মার্চ, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ২৩শে জানুয়ারির পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। যথোচিত যত্ন ও মনোযোগের সহিত এই পত্র আমি পড়িয়াছি।

আমাদের যে ক্ষুদ্র প্রতিনিধিদলটি আপনাদের জলাধার-পদ্ধতি ও কার্যক্রম অনুধাবন করিতে চীনে গিয়াছিল, আপনার গভর্নমেন্ট তাহাদের যে সুযোগ-সুবিধা দিয়াছেন তাহার জন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আরও দুইটি প্রতিনিধিদল—একটি কৃষি-ফলনের উন্নতিসাধনের পদ্ধতি অনুধাবন করিবার জন্য ও অপরটি আপনাদের লৌহ ও ইস্পাত কার্যক্রম অনুধাবন করিবার জন্য— শীঘ্রই চীনে গিয়া পৌঁছিবে। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এই ক্ষেত্রগুলিতে আপনার দেশ যে বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়া তাহারা উপকৃত হইবে।

মিঃ চ্যাং-হ্যান-ফুকে ভারতে পাইয়া আমরা আনন্দিত এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণটি উপভোগ্য হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় সম্পদের বিকাশসাধন করিবার জন্য আমাদের নিজেদের যে-প্রচেষ্টা, তাহারও কিছু তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত যে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতির হারকে দ্রুত করিবার প্রচেষ্টার আমাদের এই দুই দেশ যে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে তাহার সমাধানের দিক দিয়া এইরূপ ভ্রমণ-বিনিময় আমাদের উভয় দেশের পক্ষেই খুবই সাহায্যকারী হইবে।

আপনার পত্র পাইয়া, ভারত ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যকার সীমানা নির্ধারণের ভিত্তিটি আমি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। এ কথা সত্য যে, এই সীমান্তে ভূমিখণ্ডের সমস্ত অংশের সীমানা স্থিরীকৃত হয় নাই, কিন্তু এই সীমান্ত কোনোদিনই চীনের গভর্নমেন্টের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই এ কথা জানিয়া আমি কিছু পরিমাণ বিস্মিত হইয়াছি। আপনার জানা থাকিতে পারে যে, উচ্চ হিমালয় পর্বতমালার শীর্ষে যে জলাশ্রয় থাকে, তাহার ভৌগোলিক নীতি অনুসরণ করিয়াই চিরাচরিত সীমান্ত ঠিক করা হয়; কিন্তু ইহা ছাড়াও, নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তির মঞ্জুরিও রহিয়াছে। এই সমস্ত চুক্তির কতকগুলির প্রতি যদি আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করি, তাহা বোধ হয় কার্যকর হইতে পারে :

(১) **সিকিম**—ভারতের একটি সামন্তরাজ্য। এই সিকিমের সঙ্গে চীনের তিব্বত অঞ্চলের যে সীমানা তাহার সংজ্ঞা ১৮৯০-এর ইঙ্গ-চীন সম্মেলনে স্থির হয় এবং ১৮৯৫-এ সীমানার ভূমিখণ্ড যুক্তভাবে চিহ্নিত হয়।

(২) **জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের লাদাক-অঞ্চল**—একদিকে কাশ্মীর এবং অন্য দিকে চীনের ও অপরদিকে ভারত ও বর্মার সীমানা নির্ধারিত হইয়াছে। আপনার এক সন্ধিতে লাদাক অঞ্চলের ভারত-চীন সীমানার উল্লেখ আছে। ১৮৪৭-এ চীন গভর্নমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন যে এই সীমানা পরিপূর্ণ ও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। চীন এখন যে অঞ্চল দাবি করিতেছে তাহা সরকারি মানচিত্রে বরাবরই ভারতের অংশ বলিয়া দেখান আছে। এই অঞ্চলগুলি ভারতীয় কর্মচারীরা জরিপও করিয়াছে এবং এমনকি, ১৮৯৩-এর একটি চীনা মানচিত্রেও এগুলি ভারতীয় এলাকা বলিয়া দেখান হইয়াছে।

(৩) **ম্যাকমোহন লাইন**—আপনি জানেন যে, তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইনটি ভুটানের পূর্ব সীমান্ত হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে এবং ইহা দ্বারা একদিকে চীনের ও অপরদিকে ভারত ও বর্মার সীমানা নির্ধারিত হইয়াছে। আপনার নিকট যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিপরীতই হইয়াছে; অর্থাৎ, বস্তুত এই লাইনটি অঙ্কিত হইয়াছে ১৯১৩-১৪-এ সিমলায় অনুষ্ঠিত চীন, তিব্বত ও ভারত গভর্নমেন্টের পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতদের লইয়া এক ত্রিদলীয় সম্মেলনে। এই সীমান্তটির, অর্থাৎ লাঞ্চেন শাতরা-র অঙ্কিত লাইনটি স্বীকার করার সময় এক পত্র বিনিময়ে তিব্বতীয় রাষ্ট্রদূত পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছিলেন যে, এই সম্মেলন-চুক্তির সহিত সংযুক্ত মানচিত্রে যে সীমানা চিহ্নিত আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইবার জন্য তিনি লাসা হইতে নির্দেশ পাইয়াছেন। পূর্ণ আলোচনার পরই এই লাইনটি অঙ্কিত হয় এবং পরে আনুষ্ঠানিক পত্র বিনিময়ের দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় এবং এরূপ কোনো কিছুই নাই যাহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই স্বীকৃত সীমানা সম্পর্কে তিব্বতীয় কর্তৃপক্ষ কোনোপ্রকার অসন্তুষ্ট। তাহা ছাড়া, যদিও অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বতের মধ্যকার এবং তিব্বত ও চীনের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কে চীনা রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু, কি আলোচনার সময়ে, কি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার সময়ে, কোনো সময়েই ভারত-তিব্বত সীমান্ত সম্বন্ধে চীন পক্ষের ভিন্ন মতের কোনো উল্লেখ নাই। ঘটনাচক্রে এই লাইনটির একটি সুবিধা আছে। উত্তরে তিব্বতীয় মালভূমি ও দক্ষিণে অর্ধ-পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদরেখা হিসাবে যে উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা রহিয়াছে সেই পর্বতমালার শীর্ষদেশ ধরিয়া এই সীমারেখাটি গিয়াছে। আমাদের পূর্বকার আলোচনার এবং বিশেষ করিয়া ১৯৫৭-এর জানুয়ারিতে আপনার ভারতে আগমনের সময় আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এই অঞ্চলটিতে চীন ও ভারতের মধ্যকার সীমানা হিসাবে এই লাইনটিকে স্বীকার করিয়া লইতে আপনি প্রস্তুত; এবং আমি আশা করি, ইহার ভিত্তিতে আমরা একটা বোঝাবুঝিতে পৌঁছিব।

এইভাবে, চীনের সহিত আমাদের সীমানার খুব বড় এক অংশ লইয়া এই যে তিনটি বিভিন্ন অঞ্চল রহিয়াছে, এই তিনটি অঞ্চলের সীমানা আমাদের প্রকাশিত মানচিত্রে যেভাবে দেখান হইয়াছে, তাহার পক্ষে ভূগোল, ঐতিহ্য ও সন্ধির ভিত্তিতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নেপাল; ভারত ও তিব্বতের সংযোগস্থল হইতে লাদাক পর্যন্ত বাকি যে অংশ রহিয়াছে তাহারও ঐতিহ্য এবং সুনির্ধারিত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এখানেও একদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিমের নদী এবং অন্য দিকে উত্তর ও পূর্ব দিকের নদী—এই দুই নদীগুলির মধ্যে যে সুনির্ধারিত জলাশয় আছে সেই জলাশয় ধরিয়া এই সীমানাটি

গিয়াছে। পুরাতন কর আদায়ের নথিপত্র ও মানচিত্রের দ্বারা এবং বহু দশক ধরিয়া এই সীমানা পর্যন্ত ভারতীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ দ্বারা এই সীমারেখাটি স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে।

বরহোতি সম্বন্ধে (যাহাকে আপনারা বলেন উ-জে) বলিতে গেলে, আলাপ-আলোচনার দ্বারা ইহার ন্যায্য মালিকানা যে স্থির করা উচিত সে বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। গত বৎসর যে কথাবার্তা হইয়াছিল সেই সময় আমরা প্রচুর দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে এই অঞ্চলটি ভারতীয় এক্তিয়ারের অধীন ছিল এবং ইহা আমাদের সীমান্তের অনেক ভিতরের দিকে অবস্থিত। যতক্ষণ না ইহার বিপরীত প্রমাণ দাখিল করা হইতেছে, ততক্ষণ সরজেমিন তদন্ত দ্বারা এ বিষয়ের উপর কার্যকর কোনো আলোকপাত হইতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও, কোনো পক্ষই এই অঞ্চলে তাঁহাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের পাঠাইবেন না এই মর্মে উভয়ের সম্মত হওয়ার প্রস্তাবে আমরা রাজি আছি। দুর্ভাগ্যবশত, আপনাদের প্রতিনিধিদল আমাদের পরামর্শে সম্মত হন নাই। আমি জানিতে পারিলাম যে, পরে অবস্থার বাস্তব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে গত শীতকালের প্রথম দিকে আমাদের নিজেদের বেসামরিক দল এই অঞ্চল হইতে চলিয়া আসার পর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চীনা বেসামরিক ও সামরিক দলকে সেই অঞ্চলে শিবির সংস্থাপন করিতে পাঠানোর দ্বারা। শীতকালে হোতিতে গিয়া সশস্ত্র চীনা দল শিবির সংস্থাপন করিয়াছে এবং স্থায়ী ঘরদুয়ার তৈয়ারি করিতেছে বলিয়া যে সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাই মনে হইবে যে, বিরোধমূলক অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আপনাদের দাবি জাহির করার জন্যই প্রথা-বহির্ভূতভাবে একতরফা কার্যক্রম লওয়া হইতেছে।

আমি নিশ্চিত আশা করি যে, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে আপনার প্রত্যয় জন্মাইবে যে, আমাদের মানচিত্রে যে সীমানা প্রকাশিত হইয়াছে সেই সীমানা অঙ্কিত হইয়াছে শুধু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নহে, এই সীমানার সঙ্গে ঐতিহ্যেরও মিল রহিয়াছে এবং একটা বিরাট অংশের ক্ষেত্রে এই সীমানা আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারাও স্বীকৃত। আমার পক্ষে এ কথা বলা বাহুল্য যে, স্বাধীন ভারত কখনও তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত সীমান্তের বাহিরে গিয়া অন্যের এলাকা দখল করিবে না। আমাদের অভিন্ন সীমান্তের সাধারণ প্রশ্নটি উভয়পক্ষের দিক দিয়াই সন্তোষজনকভাবে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে এই বিশ্বাস লইয়াই কয়েকবার আমি পার্লামেন্টে এইরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, প্রকাশিত মানচিত্রসমূহে আমাদের সীমান্ত যেভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, আপনার গভর্নমেন্ট আমাদের মনোভাবকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছেন ও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাহাই হউক, যেহেতু কয়েকটি জায়গার সীমান্ত নির্ধারণ লইয়া আমাদের দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত কিছু মতভেদ রহিয়াছে, সেইহেতু আমি এই বিষয়ে সম্মত হইতেছি যে, সাম্প্রতিক বিরোধটির উদ্ভব হওয়ার পূর্বে যে-অবস্থা ছিল সে-অবস্থা উভয়পক্ষই বজায় রাখুন এবং কোনো পক্ষই তিনি যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন তাহা কার্যকর করিবার জন্য একতরফাভাবে কোনো কাজ করিবেন না। অধিকন্তু, যদি সম্প্রতি কোনো জায়গা দখল

করা হইয়া থাকে, তবে সে-অবস্থাটি সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত।

ভারতের ও ভুটানের এলাকার অনেক অংশকে চীনের এলাকা বলিয়া দেখাইয়া ক্রমাগত যে-চীনা মানচিত্র প্রকাশ করা হইতেছে তাহা যে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত প্রথার তথা সন্ধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এবং ইহা যে আমাদের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, তাহা আপনি বুঝিবেন। আমার পূর্বকার চিঠিতেই আমি বলিয়াছি যে, চীনের সহিত আমাদের মৈত্রীকে আমরা বিশেষ মূল্য দিই। আমাদের এই দুই দেশই পঞ্চশীল নীতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই নীতি আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। যদি এই সমস্ত সীমান্ত প্রশ্নগুলি আমাদের এই দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতিসাধন এখন করে, তাহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। তাই আমি আশা করি যে, শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি বোঝাবুঝিতে পৌঁছান যাইবে।

সহৃদয় শ্রদ্ধার সহিত—

আন্তরিকভাবে আপনার
(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে লিখিত প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর পত্র

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

পিকিং
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

মান্যবর, আপনার ১৯৫৯ সালের ২২শে মার্চের পত্রখানি আমি সযত্নে পড়িয়াছি। আপনার পত্র হইতে দেখিতেছি, চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নে আমাদের দুই সরকারের মনোভাবের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি কিছুটা বিস্মিত হইয়াছি; আপনার পত্রের কি জবাব দিব, তাহা বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য আমার অধিকতর দীর্ঘ সময় লইবারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে এই কারণেই।

চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নটি জটিল; ইতিহাস উহা অমীমাংসিত রাখিয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নটিতে হাত দিতে গেলে, চীনে ব্রিটিশ আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমির কথাটি প্রথমেই হিসাবে না আনিয়া পারা যায় না; ভারত তখন ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। অনেক আগে হইতেই চীনের তিব্বত এলাকার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি ছিল। নামে-স্বাধীন তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টায় ব্রিটেন তিব্বতকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য নিরন্তর উস্কানি দিয়াছে। এই মতলব ব্যর্থ হইলে তিব্বতের উপর চীনের তথাকথিত অধিরাজত্ব (সুজেরেনটি) বজায় রাখিতে দিয়াও তিব্বতকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকা করিয়া তুলিবার অভিসন্ধি লইয়া ব্রিটেন চীনের উপর যাবতীয় চাপ দিয়াছে। ইতিমধ্যে, ভারতকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়া ব্রিটেন চীনের তিব্বত এলাকায়, এমনকি সিনকিয়াং এলাকায়ও ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক সম্প্রসারণকার্য চালাইয়াছে। চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নে যে দীর্ঘমেয়াদী বিরোধ রহিয়া গিয়াছে এবং প্রশ্নটি যে মীমাংসিত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ ইহাই।

চীন ও ভারত উভয় দেশই দীর্ঘকাল যাবত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ পদানত ছিল। এই সম-অভিজ্ঞতার ফলে, উপরে কথিত ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে স্বভাবতই চীন ও ভারতের একই মত হওয়া উচিত ছিল এবং সীমান্তের প্রশ্নেও উভয় দেশের পারস্পরিক সহানুভূতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ন্যায্যতা ও যুক্তিযুক্ততার মনোভাব অবলম্বন করা উচিত হইত। চীন সরকার গোড়ায় ভাবিয়াছিলেন যে, ভারত সরকার এইরূপ মনোভাবই অবলম্বন করিবেন। কিন্তু চীন সরকারের পক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে, ভারত সরকার দাবি করিলেন যে, চীনের তিব্বত এলাকার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আক্রমণের কর্মনীতি প্রয়োগের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে চীন সরকার বিধিবদ্ধভাবে স্বীকার করিয়া লউন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই দাবির সমর্থনে ভারত সরকার চীন সরকারের উপর সর্বপ্রকারের চাপ দিলেন, এমনকি বলপ্রয়োগ

করিতেও দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে চীন সরকার গভীরভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন না।

চীন সরকার বরাবরই এই মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান বাস্তবতার কথা মনে রাখিয়া এবং পঞ্চশীলের প্রতি অনুগত থাকিয়া, সুষ্ঠু প্রস্তুতির পর, ধাপে ধাপে, বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই উভয়পক্ষকে সীমান্তের প্রশ্নে সামগ্রিক মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন মীমাংসা হইতেছে না, ততদিনের জন্য, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে দীর্ঘকালের স্থিতাবস্থাই উভয়পক্ষের বজায় রাখা উচিত; এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা তো নহেই—কাহারও পক্ষে কোনো প্রকার একতরফা ব্যবস্থা দ্বারাও ঐ স্থিতাবস্থা বদলাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো বিরোধের ব্যাপারে—সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির শান্ত অবস্থা সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো স্থান সম্পর্কে অস্থায়ী চুক্তি হইতে পারে। ১৯৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী আপনার কাছে লিখিত পত্রে আমি ঠিক এই মূল নীতিই উপস্থিত করিয়াছি। চীন সরকার এখনও মনে করেন যে, সীমান্তের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের দুই দেশের এই পন্থাই অনুসরণ করা উচিত। মান্যবর, আপনি ১৯৫৯ সালের ২২শে মার্চ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, আপনি এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী নহেন।

মান্যবর, আপনার পত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে, এবং চীন-ভারত সীমান্তের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমি এখন চীন সরকারের মনোভাবের আরও কিছুটা ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতেছি।

১৯৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি মান্যবর, আপনার নিকট লিখিত পত্রে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, চীন-ভারত সীমান্ত কখনও বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হয় নাই। মান্যবর আপনি ইহাতে মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং চীন-ভারত সীমান্তের প্রায় সমস্ত অংশ সম্পর্কেই ভারতের প্রাক্তন সরকার ও চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আপনি প্রবলভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। চীন-ভারত সীমান্ত যে কখনও বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উপস্থিত করিতেছি :

১) লাদাকের সঙ্গে চীনের সিনকিয়াং ও তিব্বত এলাকার সীমান্ত সম্পর্কে

চীনের তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কাশ্মীরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৮৪২ সালে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল বটে। তবে, চীনের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ঐ চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য কাহাকেও পাঠান নাই; পরে তাঁহারা ঐ চুক্তি অনুমোদনও করেন নাই। অধিকন্তু, ঐ চুক্তিতে শুধু সাধারণভাবে উল্লেখ ছিল যে, লাদাক ও তিব্বত নিজ নিজ সীমান্ত মানিয়া চলিবে; সীমান্তের এই অংশের অবস্থান সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা বা ব্যাখ্যা ঐ চুক্তিতে করা হয় নাই। ইহা স্পষ্ট যে, সীমান্তের এই অংশটি উভয় পক্ষ দ্বারা বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ঐ চুক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে না; সীমান্তের এই অংশটি সম্পর্কে ভারত সরকারের একতরফা দাবি চীন সরকারকে স্বীকার করিতে বলিবার ভিত্তি হিসাবে তো ঐ চুক্তি

ব্যবহৃত হইতে পারেই না।

সীমান্তের এই অংশটি স্পষ্ট বলিয়া চীন সরকারের কর্মকর্তা ১৮৪৭ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই দেখা যায় যে, সীমান্তের এই অংশ সম্পর্কে তদানীন্তন চীন সরকারের নিজস্ব স্পষ্ট মত ছিল এবং তাই দুই পক্ষের মধ্যে সীমান্ত বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হিসাবে ঐ বিবৃতি গৃহীত হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, সীমান্তের ঐ অংশ বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৯ সাল পর্যন্তও চীন সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছিলেন, কিন্তু চীন সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। এই বছর ২৮শে আগস্ট আপনিও ভারতের লোকসভায় বলিয়াছেন যে, "উহাই ছিল পুরানো কাশ্মীর রাষ্ট্র এবং তিব্বত ও চীনা তুর্কিস্তানের মধ্যে সীমান্ত। কেহই তাহা চিহ্নিত করে নাই।" এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, সীমান্তের এই অংশ কখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে, চীন ও লাদাকের মধ্যে একটা প্রচলিত সীমারেখা রহিয়াছে; ঐতিহাসিক প্রচলন হইতে উদ্ভূত ঐ সীমারেখা অনুসারেই চীনা মানচিত্রগুলিতে চীন ও লাদাকের মধ্যকার সীমারেখা বরাবর টানা হইয়াছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর নির্দেশ অনুসারে জন ওয়াকার নামে একজন ইংরেজ "পাঞ্জাব, পশ্চিম হিমালয় ও তিব্বতের সংলগ্ন অংশগুলির" যে মানচিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সীমান্তের ঐ অংশটি যেভাবে চিহ্নিত হয়, তাহা চীন মানচিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে (১৮৫৪ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ মেজর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের 'লাদাক' নামে বইয়ে ঐ মানচিত্র সংযোজিত ছিল)।

পরে ব্রিটিশ-ভারতীয় মানচিত্রে চীনা এলাকার বড় বড় ভূমিখণ্ড লাদাকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহার কোনো আইনসঙ্গত যুক্তিও ছিল না, উভয়পক্ষের বরাবরের প্রশাসনিক পরিস্থিতির বাস্তবতার সঙ্গেও তাহার সঙ্গতি নাই।

২) চীনের তিব্বতের আরি এলাকা ও ভারতের মধ্যে সীমান্তের অংশ সম্পর্কে

আপনার পত্র হইতে দেখা যায় যে, সীমান্তের এই অংশ যে দুই দেশের মধ্যে বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হয় নাই, সে সম্পর্কে আপনিও একমত। কেবল তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই এলাকার বহু স্থানের উপর অধিকার লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধ রহিয়াছে। যেমন, তিব্বতে সাপারং জং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে সাং ও সুংশা এলাকা বরাবরই চীনের ছিল, কিন্তু ৩০ হইতে ৪০ বছর আগে ব্রিটিশরা সেখানে ক্রমে ক্রমে অভিযান চালাইয়া দখল করিয়া লয়। চীনের তিব্বত এলাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কয়েকবার ব্রিটেনের নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু কোনো ফল হয় না। এইভাবে ইহা ইতিহাসের একটি অমীমাংসিত বিষয় হিসাবে রহিয়া যায়।

(৩) ভুটানের পূর্বদিকে চীন-ভারত সীমানা সম্পর্কে

ভারত সরকার জিদ করিতেছেন যে, সীমান্তের এই অংশ বহু পূর্বেই স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে; ইহার যুক্তি হিসাবে ভারত সরকার দেখাইতেছেন যে, ১৯১৩-১৪ সালের

সিমলা সম্মেলনে চীন সরকার, তিব্বতীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে তথাকথিত 'ম্যাকমোহন সীমারেখা' নির্ধারণ করিয়াছিলেন। মান্যবর, আপনার নিকট আমি বারবার এ কথা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, তিব্বতকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিসন্ধিতে ব্রিটেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই সিমলা সম্মেলন।

বহির্তিব্বত ও অন্তর্তিব্বতের মধ্যে এবং তিব্বত ও বাদবাকি চীনের মধ্যে তথাকথিত সীমারেখা লইয়া ঐ সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল। আপনার পত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নহে—তথাকথিত 'ম্যাকমোহন সীমারেখা' লইয়া সিমলা সম্মেলনে কখনও আলোচনা হয় নাই; চীনের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিনিধির নিকট হইতে লুকাইয়া, ১৯১৪ সালের ২৪শে মার্চ দিল্লীতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ও তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির মধ্যে গোপন লিপি-বিনিময় করিয়া ঐ 'সীমারেখা' নির্ধারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বেই উহা ঘটিয়াছিল। পরে, তিব্বত ও বাদবাকি চীনের মধ্যে সীমান্তের অংশ হিসাবে ঐ সীমারেখাটিকে সিমলা চুক্তির সঙ্গে সংলগ্ন মানচিত্রে চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

তথাকথিত 'ম্যাকমোহন সীমারেখা' হইল চীনের তিব্বতের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আক্রমণের কর্মনীতির একটি ফল; চীনের কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কখনও উহা স্বীকার করেন নাই, অতএব উহা স্পষ্টতই বে-আইনি।

সিমলা চুক্তি সম্পর্কে কথা হইল এই যে, চীনের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ঐ চুক্তিতে বিধিবদ্ধভাবে স্বাক্ষর দেন না এবং ইহা চুক্তিপত্রে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রিটেন ও তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে গোপন লিপি বিনিময়ের পর বেশ দীর্ঘকাল যাবত ব্রিটেন সংশ্লিষ্ট দলিলগুলিকে প্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই; সীমান্তের এই অংশ মানচিত্রে যেভাবে বরাবর চিহ্নিত হইত, তাহা মানচিত্রে পরিবর্তন করিতেও ব্রিটেন সাহস পায় নাই। এই বে-আইনি সীমারেখা চীনে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষও পরে এই সীমারেখা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং চীনের তিব্বত এলাকার যে সকল অংশ ঐ বে-আইনি সীমারেখার দক্ষিণে অবস্থিত, তাহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মান্যবর আপনার নিকট তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন। ঐ এলাকার আয়তন চীনের চেকিয়াং প্রদেশের অনুরূপ, প্রায় ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, যে সীমারেখার ফলে এমন সুবৃহৎ ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং দেশের এলাকা বিক্রি করিয়া কলঙ্কিত হইতে হয়, তেমন বে-আইনি সীমারেখা চীন কেমন করিয়া চাপে পড়িয়া মানিয়া লইতে পারে?

তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা দেখা দিবার পূর্বে চিরাচরিত সীমান্তের যে প্রকৃত পরিস্থিতি ছিল, তাহার সঠিক প্রতিফলন হইয়াছে চীনের যাবতীয় চিরাচরিত মানচিত্রে, যাহাতে ভুটানের পূর্বদিকে চীন-ভারত সীমান্ত চিহ্নিত হইয়াছে। "তিব্বত ও সংলগ্ন দেশগুলির" যে মানচিত্র ১৯১৭ সালে ভারতীয় সার্ভে কর্তৃক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া

ব্রিটেনিকার ১৯২৯ সালের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সীমান্তের এই অংশ চীনা মানচিত্রের মতো একইভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে; কেবল ১৯৫১ সালে চীনের তিব্বত এলাকার শান্তিপূর্ণ মুক্তির সমকালে ভারতীয় ফৌজ তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার দক্ষিণস্থ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়। কাজেই, সীমান্তের এই অংশ বহুকাল হইতেই স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়াছে এই কথা স্পষ্টতই টিকে না।

মান্যবর, আপনার পত্রে আপনি চীন ও সিকিমের মধ্যে সীমান্তের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। চীন ও ভুটানের মধ্যে সীমান্তের মতো, ঐ প্রশ্নটিও আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিসরে আসে না। তবে, এই সুযোগে আমি আর একবার স্পষ্ট করিয়া নিবেদন করিতে চাই যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ না করিয়া চীন সিকিম ও ভুটানের সঙ্গে বন্ধুভাবেই থাকিতে ইচ্ছুক এবং চীন বরাবর ঐ দুইটি দেশ ও ভারতের মধ্যেকার সমীচীন সম্পর্কের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছে।

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, চীনে প্রকাশিত মানচিত্রে চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর যেভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিহীন নহে; এবং প্রথমে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মানচিত্রেও চীন-ভারত সীমান্তটিকে মোটামুটি চীনা মানচিত্রে যেমন সেইভাবেই চিহ্নিত করা হইত। প্রকৃতপক্ষে, চীনা মানচিত্রে নহে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় মানচিত্রেই—চীন-ভারত সীমান্ত যেভাবে চিহ্নিত হইত তাহা পরে একতরফাভাবে পরিবর্তন করা হয়। তবে, যেহেতু চীন ও ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও যুক্ত জরিপের মাধ্যমে পারস্পরিক সীমান্ত নির্ধারণ করেন নাই, সেইহেতু চীন ভারতকে মানচিত্র সংশোধন করিতে বলেন নাই। ঐ একই কারণে আমি ১৯৫৪ সালে মান্যবর, আপনার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ঠিক এখনই চীন সরকার কর্তৃক পুরানো মানচিত্র সংশোধন করাও অসমীচীন হইবে। অথচ, ভারতে কেহ কেহ চীনে প্রকাশিত মানচিত্র সম্পর্কে মহা কলরব তুলিয়াছেন; চীন-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে ভারতের একতরফা দাবিটিকে চীনকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য জনমতের চাপ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা বিজ্ঞজনোচিতও নহে, উপযুক্ত কাজও নহে।

আগেই বলা হইয়াছে, চীন সরকার বরাবরই চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নে সুস্পষ্ট কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। এই নীতি হইল—একদিকে, সমগ্র চীন-ভারত সীমান্ত নির্ধারিত হয় নাই—এই ঘটনার স্বীকৃতি, অপর দিকে বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়া এবং চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিশেষভাবে মনে রাখিয়া উভয়পক্ষের দিক দিয়া ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা এবং সীমান্তের প্রশ্নটি মীমাংসিত হইবার পূর্বে দুই দেশের মধ্যে সীমান্তের যে দীর্ঘকাল অবস্থা রহিয়াছে তাহার একতরফাভাবে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা না করা।

চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাংশ সম্পর্কে আমি উপরেই বলিয়াছি, চীন সরকার তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটিকে আদৌ স্বীকার করেন না, কিন্তু চীনা সৈনিক কখনও ঐ সীমারেখা পারও হয় নাই। সীমান্তের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার পথ প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত-বরাবর সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার জন্যই এরূপ আচরণ করা হইয়াছে—ইহা দ্বারা কোনো প্রকারে ঐ সীমান্তের প্রতি চীন সরকারের

স্বীকৃতি বুঝায় না। মান্যবর, আপনার নিকট আমি এ বিষয়ে পূর্বে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা মান্যবর আপনার সর্বশেষ পত্র দুইখানাতে স্পষ্টতই ভুল বোঝা হইয়াছে দেখিয়া আমি আর একবার উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি।

চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাংশের ক্ষেত্রে চিরাচরিত, প্রচলিত সীমারেখাকেই চীন সঠিকভাবে মানিয়া চলিয়াছে এবং ভারতীয় ফৌজের বারবার চীনা এলাকায় অনধিকার প্রবেশ বা দখল সত্ত্বেও চীন সরকার সর্বদাই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কাজ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খুব সুযোগ্যভাবেই চলিয়াছেন। যেমন, 'উ-জে'-তে ভারতীয় ফৌজ ও প্রশাসনিক লোকলস্করের অভিযানের ক্ষেত্রে চীন সরকার বিষয়টি লইয়া ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসার জন্য এবং সংঘর্ষ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে সকল ভারতীয় ফৌজ চীনের সিনকিয়াং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও চীনের তিব্বত এলাকায় পানকং হ্রদ অঞ্চলে অভিযান চালাইয়াছিল, তাহাদিগকে চীন সীমান্তরক্ষীরা আন্তর্জাতিক আচরণ অনুসারে নিরস্ত্র করিয়া, যুক্তিযুক্ত মনোভাব অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে চীনা এলাকা ছাড়িয়া যাইতে বলে এবং তাহাদের অস্ত্র প্রত্যর্পণ করে। ভারতীয় ফৌজ পরপর শিপ্‌কি গিরিবর্ত্ম, পারিগাম, সাং, সুৎশা, পুলিং-সুমদো, চুভা, চুযে, সাংচা ও লাপথালে অভিযান চালাইয়া দখল করিলে, চীন সরকার তাহা জানিতে পারার পর, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, অবিলম্বে এবং মেজাজীভাবে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ তদন্ত করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা হইতে প্রমাণিত হয় যে, চীন-ভারত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চীন সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন।

সম্পূর্ণতই ভারতীয় ফৌজের অনধিকার প্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী উপরিউক্ত ঘটনাগুলি সত্ত্বেও, এই বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর আবহাওয়া মোটের উপর মোটামুটি ভালই ছিল। চীন-ভারত সীমান্ত মোটামুটি দুই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এবং তাহা পুরোপুরিই অনির্ধারিত, তবু যে কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে নাই, শুধু ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, উভয়পক্ষে বন্ধুত্বের ও যুক্তিযুক্ত মনোভাব থাকিলে এই সকল সীমান্ত এলাকায় সৌহার্দ্য বজায় রাখা যায় এবং দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উত্তেজনা বন্ধ রাখা যায়।

কিন্তু, তিব্বতে বিদ্রোহ ঘটিবার পর হইতে সীমান্তের পরিস্থিতি ক্রমেই অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জন্য চীনা পক্ষকে দায়ি করা চলে না। বৃহৎসংখ্যক তিব্বতী বিদ্রোহী পলাইয়া ভারতে যাইবার পরই ভারতীয় ফৌজ চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাংশ পার হইয়া সমানে অগ্রসর হইতে শুরু করে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্তের দীর্ঘকালের অবস্থা একতরফাভাবে পরিবর্তন করিয়া তাহারা যেমন ব্রিটেন ও তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যকার গোপন লিপিতে সংলগ্ন মানচিত্রে চিহ্নিত তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাও লঙ্ঘন করিয়াছে, তেমনি তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা অনুসারে রচিত বলিয়া কথিত সাম্প্রতিক ভারতীয় মানচিত্রে অঙ্কিত সীমান্তও অতিক্রম করিয়াছে, যদিও এই সাম্প্রতিক ভারতীয় মানচিত্রও বহু স্থানে চীনা এলাকার গভীরে ম্যাকমোহন সীমারেখা অপেক্ষাও বেশি দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় ফৌজ অভিযান চালাইয়া লোংজু দখল করিয়াছিল, ইয়াশর-এ অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, এবং

যেগুলি সবই চীনা এলাকা—সেই শা-জে, খিজেমানে ও তামাদেন দখলে রাখিয়া সশস্ত্র তিব্বতী বিদ্রোহী দুর্বৃত্তদিগকে আগলাইতেছে। ভারতীয় বিমানও চীন-ভারত সীমান্তের নিকট বারবার চীনের আঞ্চলিক আকাশ লঙ্ঘন করিয়াছে।

বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই যে, বেশি দিনের কথা নয়, ভারতীয় ফৌজ বে-আইনিভাবে লোংজু দখল করিয়া মিগিতুন এলাকায় মোতায়েন চীনা সীমান্তবাসীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, যাহার ফলে চীনা সীমান্তরক্ষীরা অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হইয়া পাল্টা গুলি চালাইয়াছিল। ইহাই হইল চীন-ভারত সীমান্তে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সম্প্রতি চীন-ভারত সীমান্তে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই ভারতীয় ফৌজের অনধিকার-প্রবেশ ও প্ররোচনার ফলেই ঘটিয়াছে এবং তাহার জন্য ভারতীয় পক্ষকেই সম্পূর্ণ দায়ি বলিতে হইবে। তবুও, ভারত সরকার চীন সরকারের বিরুদ্ধে যাবতীয় ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করিয়া, চীন ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের কাজ করিয়াছে বলিয়া সোরগোল তোলা হইয়াছে এবং মিগিতুন এলাকায় চীনা সীমান্তরক্ষীদের আত্মরক্ষাকার্যকে সশস্ত্র প্ররোচনা বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। ভারতে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রচার-যন্ত্র এই উপলক্ষ্যটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রচুর চীন-বিরোধী কথাবার্তা বলিয়াছেন—কেহ কেহ আরও ব্যাপক আকারে খোলাখুলিভাবে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের জন্য ওকালতি করিয়া চীনা এলাকায় বোমাবর্ষণ পর্যন্ত করিতে বলিয়াছেন। এইভাবে ছয় মাসের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয়বার চীন-বিরোধী প্রচার-অভিযান শুরু হইয়াছে।

চীন-ভারত সীমান্তের অনির্ধারিত অবস্থা ভারত মানেন না এবং চীনের উপর সামরিক, কূটনৈতিক ও জনমতের চাপ তীব্রতর করিয়া তুলিতেছেন—ইহা হইতে এই সন্দেহ না জাগিয়া পারে না যে, ইহা হইল সীমান্তের প্রশ্নে চীনের উপর ভারতের একতরফা দাবি চাপাইয়া দিবার চেষ্টা। ইহা বলা দরকার যে, এই চেষ্টা কখনও সফল হইবে না এবং ইহার ফলে শুধু দুই দেশের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণই হইতে পারে, সীমান্তের প্রশ্ন আরও জটিল এবং উহার মীমাংসা আরও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে; উহার অন্য কোনো ফল হইতে পারে না।

চীন ও ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তি হইল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল। চীন সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই বলিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য শান্তিপূর্ণ পরামর্শের মধ্য দিয়া মীমাংসা করিতে হইবে এবং তাহা নিশ্চয়ই করা সম্ভব; তাহা বজায় রাখিয়া দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া যায় না। চীন তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তকে শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসাবেই দেখে।

আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সশস্ত্র তিব্বতী বিদ্রোহীরা যাহাতে সীমান্ত পার হইয়া যাতায়াত করিয়া হয়রানি চালাইতে না পারে, শুধু সেইজন্যই চীন সরকার সম্প্রতি কয়েক মাসে চীনের তিব্বত এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশে মোতায়েন করিবার জন্য কিছু রক্ষী ইউনিট পাঠাইয়াছেন। ইহা স্পষ্টতই সীমান্তে শান্ত অবস্থা সুনিশ্চিত করিবার জন্য; ইহা কোনোক্রমেই ভারতের বিপদের কারণ হইতে পারে না।

আপনি পঞ্চশীলের অন্যতম উদ্যোক্তা; চীন-ভারত বন্ধুত্ব সংহত ও বিকশিত করিতে আপনার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রহিয়াছে; এই বন্ধুত্বের গুরুত্বের উপর আপনি নিরন্তর জোর দিয়াছেন। ইহা চীনের সরকার ও জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তাই আমি চীন-ভারত সীমান্তের সমগ্র চিত্র সম্পর্কে এই বিশদ ব্যাখ্যা দিলাম। আমি আশা করি, আপনি ও ভারত সরকার চীন সরকারের অনুরোধ অনুসারে, অনধিকার-প্রবেশকারী ভারতীয় ফৌজ ও প্রশাসনিক লোক-লস্করকে অবিলম্বে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দুই দেশের মধ্যে সীমান্তের দীর্ঘকালের স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপন করিবেন। তাহা হইলে চীন-ভারত সীমান্তের ব্যাপারে সাময়িক উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে উপশম হইবে এবং দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের উপর হইতে গভীর কালো মেঘ দ্রুত কাটিয়া যাইবে। তাহা হইলে, চীন-ভারত বন্ধুত্বের সম্পর্কের জন্য যাঁহারা উদ্‌গ্রীব—আমাদের সেই বন্ধুরা আশ্বস্ত হইবেন এবং যাহারা চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভেদের বীজ ছড়াইতেছে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের উপর আঘাত পড়িবে।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
(স্বাঃ) চৌ এন-লাই

চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট লিখিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

নূতন দিল্লী
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ১৯৫৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি পড়িয়া যে অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম, তাহা উল্লেখ করিতেছি। ১৯৫৪ সালে পিকিং-এ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে আপনার ও আমার মধ্যে ভারত-চীন সীমান্ত লইয়া এবং বিশেষত পূর্বাংশ লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। আপনি জানেন, পূর্বাংশে সীমারেখাটিকে অসতর্ক ভাষায় ম্যাকমোহন সীমারেখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এইভাবে অভিহিত করা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু সুবিধার খাতিরে সীমারেখাটিকে ঐ নামেই উল্লেখ করিতে চাই। ইহা লইয়া আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় আমি ভাবিয়াছিলাম, সীমানার পূর্বাংশে তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইনটি ঠিক কোথায় পড়ে, সেই সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছাইবার সমস্যাটিই রহিয়াছে আমাদের সম্মুখে। দশকের পর দশক যাবৎ এবং কোনো কোনো অংশে এক শতকের অধিক কাল যাবৎ যাহা তর্কাতীতভাবেই ভারতীয় ভূখণ্ড, তাহারই প্রায় ৪০,০০০ বর্গমাইল এলাকার উপর চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র কোনো দাবি উপস্থিত করিবে, তাহা আপনার ১৯৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখের পত্র পাইয়াও আমি ভাবিতে পারি নাই। আপনার সর্বসাম্প্রতিক পত্রে আপনি বৃহৎ বৃহৎ ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর দাবি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমনকি, চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-আক্রমণ হইতে ভারতের স্বাধীন সরকার সুবিধা করিয়া লইতে চাহিতেছে, এমন কথাও আপনি বলিতে চাহিয়াছেন। আমাদের পার্লামেন্ট এবং আমাদের জনগণ এই অভিযোগ শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। দেশে এবং বিদেশে যে-কোনো প্রকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামের কথা পৃথিবীর সর্বত্র সুবিদিত ও স্বীকৃত এবং আমরা ভাবিয়াছিলাম চীনও আমাদের সংগ্রাম যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করে এবং স্বীকার করে। ভারতীয় জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় উপ-মহাদেশটিকে ইংরাজরা দখল করিয়াছিল এবং শাসন করিত, তাহা সত্য। তবু, ভারতের সীমান্তগুলি কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, প্রচলন ও চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুসারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মীমাংসিতই ছিল। সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির সম্বন্ধে ভারতের অপছন্দ ভাব তিব্বতের প্রতি মনোভাবের মধ্যে যেরূপ স্পষ্ট দেখান হইয়াছে, বাস্তবিক এমন আর কিছুতেই দেখান হয় নাই। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটেন যত অতি-রাষ্ট্রীক (এক্স্ট্রা-টেরিটোরিয়াল) অধিকার ভোগ করিত, সেই সবই ভারত সরকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, সন্ধি-চুক্তিতেই তিব্বতকে চীনের একটি অঞ্চল বলিয়া স্বীকৃতি দেন। আপনি যখন শেষবার ভারতে আগমন করেন, তখন

আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বত চীনেরই অংশ ছিল এবং আছেও, কিন্তু ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।

আপনার পত্রে আপনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, চীন সরকারকে দিয়া ভারতে দাবি মানিয়া লওয়াইবার জন্য ভারত সরকার চীন সরকারের উপর বলপ্রয়োগ সমেত সর্বপ্রকার চাপ দিয়াছেন। ভারত সরকার যাহা করিয়াছেন, ইহা তাহার বিপরীত। ১৯৫৪ সাল হইতে চীনা লোকলস্কর সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া আমাদের যেসব এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, লাদাকে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া যে সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ১৯৫৮ সালে আকসাই চিন্ এলাকায় আমাদের লোকলস্করকে গ্রেপ্তার করিয়া যে আটক করা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ে আমাদের হাতে যে-তথ্য ছিল, তাহা আমরা সাধারণ্যে প্রকাশ করি নাই। উভয়পক্ষের জনসাধারণের মধ্যে কোনো উত্তেজনা ছাড়াই, দুই দেশের মধ্যে মতৈক্যের মধ্য দিয়া বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা যাইবে, এই আশায় আমরা ঐ সকল তথ্য প্রচার করি নাই। প্রকৃতপক্ষে, তাহা না করিবার ফলেই আমাদের দেশে পার্লামেন্টে ও সংবাদপত্রগুলিতে সরকারের তীব্র কিন্তু ন্যায্য সমালোচনা হইয়াছে। বলপ্রয়োগ করা দূরের কথা, বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই আমরা চাহিয়াছি। ১৯৫৮ সালে বড়াহোতি লইয়া ভারতীয় ও চীনা প্রতিনিধিদের মধ্যে যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল এবং অন্যান্য বিরোধের বিষয়ে আমাদের দুই সরকারের মধ্যে যে-সকল মন্তব্য-লিপি বিনিময় হইয়াছিল, তাহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ম্যাকমোহন লাইনের আমাদের দিকে অবস্থিত লোংজুতে আমাদের ফাঁড়িটিকে দখল করিয়া লইবার ব্যাপারে আপনাদের সৈন্যসামন্ত যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে ভারতের বিপুল ক্ষোভ রহিয়াছে, তাহা আপনাকে না বলিলেও চলে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনারা সৈন্যসামন্ত অপসারণ না করা সত্ত্বেও, আমরা ফাঁড়িটি পুনর্দখল করিবার চেষ্টা করি নাই।

সীমান্তে দীর্ঘকালের স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত সরকার বরাবরই ইহার পক্ষপাতী। সম্প্রতি কয়েক বছরে বারবার ইহা লঙ্ঘন করিয়াছেন চীন সরকারই। দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি—যেমন, আকসাই চিন্ এলাকায় চিরাচরিত ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া ১০০-মাইল রাস্তা নির্মাণ, ১৯৫৭ সালে লোহিত সীমান্ত বিভাগে চীনা জরিপ-দলের প্রবেশ, ১৯৫৯ সালে স্পাঙ্গুরে একটি শিবির স্থাপন, ১৯৫৮ সালে বড়াহোতিতে সশস্ত্র লোকলস্কর প্রেরণ এবং প্রচলিত রেওয়াজের বিরুদ্ধে গিয়া সেই সশস্ত্র লোকলস্কর সেখানে মোতায়েন রাখা, এবং সর্বশেষে বলিতেছি লোংজুতে বলপ্রয়োগের কথা, যে ঘটনাটি মোটেই ছোট ঘটনা নহে।

চীন ও ভারতের মধ্যে সমগ্র সীমান্ত বিধিবদ্ধভাবে চিহ্নিত হয় নাই, তাহা সত্য। প্রকৃতপক্ষে, চীন-ভারত সীমান্তের বহু স্থানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ভূমিতে কোনো স্থূল চিহ্ন স্থাপন করা অসম্ভব। তবে, সমগ্র সীমান্তটি হয় সন্ধি-চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া আছে, নহিলে প্রচলন অনুসারে স্বীকৃত কিংবা উভয় দিক দিয়াই স্বীকৃত আছে। এবং প্রচলিত সীমান্ত পর্যন্ত ভারত সরকারের এক্তিয়ার প্রয়োগের বিরুদ্ধে চীন সরকার এখন অবধি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। এই বছরের প্রথম অবধি আমাদের সীমান্ত বরাবর কখনও কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে নাই, সে-কথা আপনি নিজেই স্বীকর করিয়াছেন। চীনের সমস্ত

সরকার ভারতীয় সীমান্ত মানিয়া চলিয়াছেন। চীনের পূর্ববর্তী সরকারগুলি যে দুর্বল ছিলেন, তাহা কোনো উপযুক্ত জবাব নহে। ১৯০৬ এবং ১৯৩৭ সালের মধ্যে বর্মার ক্ষেত্রে যেরূপ করা হইয়াছিল, স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় আচার অনুসারে তেমন কোনো প্রতিবাদও এ-ব্যাপারে জ্ঞাপন করা হয় নাই।

তিব্বত ও লাদাকের মধ্যে সীমান্ত প্রসঙ্গে—১৮৪২ সালে তিব্বত ও কাশ্মীরের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য চীনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রতিনিধি পাঠান নাই, এমন কথা ঠিক নহে। দলাই লামা ও চীনের সম্রাট—উভয়েরই প্রতিনিধিরা এই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। অন্যতম স্বাক্ষরকারী কালোন সকোন জন্মসূত্রে তিব্বতী হইলেও, তিনি একজন চীনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এমনকি, সন্ধি-পত্রের তিব্বতী ভাষ্যেও একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, চীন এই সন্ধিতে একটি পক্ষ ছিল। ইহাতে ঘোষণা আছে যে, "যতদিন জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনের মধ্যে জগতের রাজা সিরি খালসাজী শাহিব এবং সিরি মহারাজ শাহিব রাজা-ই-রাজাগন রাজা শাহিব বাহাদুর, এবং চীনের খাগান্ এবং লাসার লামা গুরু শাহিবের মধ্যে সন্ধি অনুযায়ী মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও ঐক্যে ভবিষ্যতে কখনও কোনোক্রমে কেশ-পরিমিত বিচ্যুতিও ঘটিবে না এবং কোনো ভাঙনও ধরিবে না।"

১৮৪২ সালের সন্ধি-পত্রে যে কেবল "প্রাচীন স্বীকৃত সীমান্তের" কথাই আছে, তাহা সত্য। তাহার কারণ, এই সকল সীমান্ত সুবিদিতই ছিল এবং বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করিবার কোনো প্রয়োজন তাহাতে ছিল না। এমনকি, লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে ১৬৮৪ সালের সন্ধি-পত্রেও বিবৃত আছে যে, "গোড়ায়, স্কাইদ-ইদা-ন্‌গীমাগন তাঁহার তিন পুত্রের প্রত্যেককে এক-একটি রাজত্ব দিবার সময় যে সীমান্ত নির্দিষ্ট ছিল, তাহাই এখনও বজায় রাখা হইবে।" ১৭শ শতকের লাদাকী ঘটনাপঞ্জীর কোনো কোনো বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, সীমান্ত ভালভাবেই স্বীকৃত ছিল। মান্যবর, আপনি কানিংহামের কথা সমাদরের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—সেই কানিংহাম ১৮৪৬ সালে ঐ এলাকায় সফর করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে তিনি বলেন, লাদাকের পূর্ব সীমান্ত "স্তূপ স্তূপ পাথর দিয়া সুনির্দিষ্ট; খ্রীষ্টীয় ১৬৮৭ সালে সোক্‌পো বা মঙ্গোল বাহিনীকে শেষবার বহিষ্কৃত করিবার পর ঐ স্তূপগুলি স্থাপন করা হইয়াছিল; লাদাকীরা তখন কাশ্মীর হইতে প্রচুর সহায়তা লাভ করে।" ('লাদাক', ১৮৫৪, পৃষ্ঠা ২৬১)। এইভাবে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া লাদাক ও তিব্বতের মধ্যকার সীমান্তটি উভয়পক্ষেরই সুবিদিত ও স্বীকৃত ছিল। এইসকল সন্ধি-চুক্তির ব্যবস্থা অনুসারে এই দুই শতাব্দী ধরিয়া লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল এবং কখনও কোনো সীমান্ত-বিরোধ দেখা দেয় নাই।

আপনার পত্রে বলা হইয়াছে যে, ১৮৪২ সালের সন্ধি-চুক্তিটিকে চীন কখনও অনুমোদন করেন নাই। চীন যে সন্ধি-চুক্তিটিকে স্বীকার করিতেন, তাহা এই তথ্যটি হইতেই স্পষ্ট হইয়া যায়। চীনা কর্মকর্তাটি ১৮৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকারকে জানাইয়াছিলেন : "সীমান্ত সম্পর্কে আমি নিবেদন করিতে চাই যে, ঐ সকল অঞ্চলের সীমান্তগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট, কাজেই, এই প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসরণ করাই সবচেয়ে

ভাল; ঐ সকল সীমান্ত নির্দিষ্ট করিবার জন্য কোনো অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকাই সুবিধাজনক।" চীন সরকার সন্ধি-চুক্তিটিকে অসিদ্ধ মনে করিতেন, এমন কোনো ইঙ্গিত ছিল না। উপরে উদ্ধৃত বিবৃতি হইতে ইহাও স্পষ্ট যে, সীমান্তটি কি তাহা জানা ছিল; কেবল তাহাই নহে—সীমান্তটি স্পষ্টভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্টও ছিল; সীমান্তটি যে কোথায়, তাহা লইয়া কোনো মতভেদও ছিল না।

চীন যে ১৮৪২ সালের সন্ধি-চুক্তিটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ হইতেছে এই যে, সন্ধি-চুক্তিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সওগাত-বিনিময় সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা একেবারে ১৯৪৬ সাল অবধি চালু ছিল; চীন সরকার তাহাতে কোনো প্রকার বাধা দেন নাই।

সীমান্তের এই অংশটিকে বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু চীন সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই, এ কথা ঠিক নহে। এই রকম বিধিবদ্ধভাবে সীমান্ত নির্ধারণের কোনো প্রস্তাব ১৮৪৭ হইতে ১৮৯৯ সালের মধ্যে করা হয় নাই। ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ সরকার যে-প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা তিব্বতের সঙ্গে লাদাকের পূর্ব-সীমান্ত সম্পর্কে নহে; তাহা ছিল সিন্‌কিয়াংয়ের সঙ্গে লাদাক ও কাশ্মীরের উত্তর সীমান্ত সম্বন্ধে। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে, উত্তর সীমান্তটি গিয়াছে কুয়েন্ লুন পর্বতশ্রেণী বরাবর ৮০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্বে একটি বিন্দু পর্যন্ত—সেখানে উহা লাদাকের পূর্ব সীমান্তে গিয়া পড়ে। আক্‌সাই চিন্-এর সমগ্র এলাকাটি যে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত, তাহা ইহা হইতে সন্দেহাতীতভাবেই দেখা যায়। চীন সরকার তখন এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান নাই।

তাহা হইলে, লাদাক, তিব্বত ও চীন সকলেই প্রচলিত সীমান্তকে লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছেন, "পাঞ্জাব, পশ্চিম হিমালয় ও তিব্বতের সন্নিহিত অংশগুলির" যে মানচিত্র ওয়াকার সংকলন করিয়াছিলেন—যাহা কানিংহামের ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকে সংযোজিত আছে, তাহাতে যে-সীমান্ত দেখান হইয়াছে, মোটামুটিভাবে তদনুযায়ী সীমান্তই দেখান হয় চীনের মানচিত্রে। ওয়াকারের মানচিত্রের সংকলন-সূচীতে বলা হইয়াছে যে, এই অংশের জন্য যে-দলিল ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইল "ক্যাপ্টেন এইচ. স্ট্রাচি কৃত লাদাক ও নারি খোরসুমের মানচিত্র।" স্ট্রাচি কিন্তু ১৮৪৭ সালে লাদাকের শুধু একটি অংশে সফর করিয়াছিলেন। আক্‌সাই চিন্ এলাকায় কখনও যান নাই বলিয়া ঐ এলাকা সম্পর্কে তিনি সামান্যই জানিতেন, কিংবা কিছুই জানিতেন না। এই এলাকায় জল-বিভাজিকাই (ওয়াটার-পার্টিং) প্রাকৃতিক ও স্বীকৃত প্রাচীন সীমান্ত, এবং প্রধান জল-বিভাজিকার অবস্থান যেখানে মনে করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি সীমান্তটি আঁকিয়াছিলেন। উহার পরে ভারত সরকার অনুসন্ধান ও জরিপকার্যের কয়েকটি দলকে ঐ অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় প্রমাণাদি যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার ভিত্তিতে তাঁহারা চিরাচরিত সীমারেখা নিরূপণ করিয়াছিলেন। জনসন এই এলাকায় গিয়াছিলেন ১৮৬৫ সালে এবং কাশ্মীরের মহারাজার অধীনে নিযুক্ত ইংরাজ ফ্রেডারিক ড্রু লাদাকের গভর্নর হিসাবে গিয়াছিলেন ১৮৬৯ সালে। উনিশ শতকে অন্যান্য জরিপ-দল ছিল—১৮৬৮ সালে হেওয়ার্ড, শ' ও

কেলে-র, ১৮৮৫-৮৭ সালে ক্যারি-র, ১৮৯১ সালে হ্যামিলটন বাওয়ারের, ১৮৯৫ সালে লিট্‌লডেলের, ১৮৯৬ সালে ওয়েল্‌বি ও ম্যালকমের, ১৮৯৬ সালে ডৌজি ও পাইক্‌-এর এবং ১৯০০ সালে অরেল স্টেইনের। উপরে উল্লিখিত জরিপগুলিতে জল-বিভাজিকার সঠিক অবস্থান নিরূপিত হইবার পর, এইভাবে সমগ্র লাদাক এলাকার সঠিক মানচিত্র সম্ভব হইয়াছিল মাত্র ১৮৬৫ সাল হইতে। তখন হইতে যত মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই যে চিরাচরিত সীমান্ত দেখান হয় তাহা আমাদের মানচিত্রগুলিতে আমাদের দ্বারা প্রদর্শিত রেখা অনুয়ায়ীই—চীন যে-দাবি করিয়াছেন, তদনুযায়ী নহে, ইহাও তাৎপর্যসম্পন্ন। ১৮৬৭-৬৮ সালে প্রকাশিত ওয়াকারের নিজেরই তুর্কীস্তানের পরবর্তী মানচিত্র, ড্রু-র 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' (১৮৭৫) নামে বইয়ে সংযোজিত তাঁহারই মানচিত্র, জনস্টনের ভূচিত্রাবলী (১৮৮২) এবং ১৮৯০ সাল হইতে প্রকাশিত 'গেজেটিয়ার্স অব কাশ্মীর'-এ সংযোজিত মানচিত্রগুলিতে মোটামুটি আমাদের বর্তমান সীমান্ত অনুসারে সীমারেখা দেখান হইয়াছে। এমনকি, উনিশ শতকের শেষের দিকে সরকারি চীনা মানচিত্রেও যে সীমান্ত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রায় আমাদের সীমারেখার মতোই। কেবল বিংশ শতকের সরকারি চীনা মানচিত্রগুলিতে আমাদের ভূখণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ অংশকে চীন সরকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অপর পক্ষে, প্রামাণ্য জরিপের ভিত্তিতে 'নর্থ চায়না ডেইলি নিউজ অ্যান্ড হেরাল্ড' ১৯১৭ সালের পর কোনো এক সময়ে সাংহাইয়ে যে 'নিউ অ্যাটলাস অ্যান্ড কমার্শিয়াল গেজেটিয়ার অব চায়না' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত আমাদের বিন্যাসের অনুরূপ এবং উত্তর-পূর্বে যে সীমান্ত তাহাতে দেখান হইয়াছে, উহা পরে ম্যাকমোহন সীমারেখা বলিয়া পরিচিত সীমান্তের কাছাকাছি। আমি আরও উল্লেখ করিতে পারি যে, চীনের পক্ষ হইতে যাহা ঘোষণা করা হয়, তাহা যেখানে অনুমোদিত হয় না, সেখানে চীনা মানচিত্রগুলি ওয়াকারের ১৮৮৫ সালের মানচিত্র অনুযায়ীও নহে। যেমন, দেম্‌চকের উত্তরে ও পাংগংয়ের উত্তরে অবস্থিত এলাকাগুলিকে ওয়াকার ভারতের মধ্যে দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক চীনা মানচিত্রগুলিতে এই এলাকাগুলি ওয়াকারের মানচিত্র অনুযায়ী দেখান হয় নাই।

তিব্বতের আরি এলাকা বলিয়া পরিচিত এলাকা ও ভারতের মধ্যে সীমান্তের যে-অংশ পড়ে, তাহার কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আরি হইল ন্‌গারি খোরসুমের সংক্ষিপ্ত নাম, এবং আমাদের বলা হইতেছে যে, আরি হইল উত্তর-পশ্চিম তিব্বত। ভারতের পাঞ্জাব, হিমাচল-প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ এবং তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে সীমান্তের যে-অংশ, তাহা এই। আপনি বলিয়াছেন, এই অংশে সীমান্ত কখনও বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, এই অংশে সীমান্ত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকিবার কথা নয়। ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তির চতুর্থ ধারায় এই এলাকার চারিটি গিরিপথ নির্দিষ্ট আছে। চুক্তিটি সম্পাদিত হইবার পূর্বে এই গিরিপথগুলি লইয়া চীন ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। আপনাদের মূল খসড়ায় নিম্নলিখিত কথা ছিল : "চীন সরকার নিম্নলিখিত গিরিপথগুলি খুলিবেন বলিয়া সম্মতি দিতেছেন।" ভারতের পক্ষ হইতে তখন শ্রীকল বলেন যে, এগুলি ভারতীয় গিরিপথ। কিছু আলোচনার পর উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বয়ান সম্পর্কে একমত হন : "উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা নিম্নলিখিত গিরিপথগুলি দিয়া যাতায়াত করিতে পারেন।" এই প্রসঙ্গে আপনার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মন্তব্য করিয়াছিলেন : "ইহা হইল আমাদের পক্ষ হইতে পঞ্চম কন্‌সেশন।" ইহা হইল ঐ গিরিপথগুলিকে সীমান্ত-গিরিপথ বলিয়া স্বীকৃতিদান। প্রকৃতপক্ষে, গিরিপথগুলির ভারতীয় প্রান্ত বরাবর ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন।

আপনি বলিয়াছেন যে, "তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইন হইল চীনের তিব্বত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আক্রমণাত্মক কর্মনীতির ফল", তাহাতে আমি বিশেষ বিস্মিত হইয়াছি। আপনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল ব্রিটিশ প্রতিনিধি ও তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির মধ্যে এবং চীনের কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কখনও উহা কবুল করেন নাই। ইহা হইতে আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চুক্তিটি বে-আইনি। প্রকৃত তথ্য কিন্তু অন্য রকম। চীন সরকারের পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও সম্মতি অনুসারেই সিমলা সম্মেলনের ব্যবস্থাদি করা হইয়াছিল। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯১৩ সালের ৭ই আগস্ট ব্রিটিশ প্রতিনিধির নিকট লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ণ-ক্ষমতাসম্পন্ন তিব্বতী ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে "যুক্তভাবে সন্ধি-চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিতে" চীনের পূর্ণ-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি ভারতে যাইবেন। সম্মেলনের বিবরণ হইতে স্পষ্ট যে, চীনের প্রতিনিধি সম্মেলনে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কেবল তাহাই নহে, চীনা ও তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের মতো সম-ভিত্তিতেই তিব্বতী প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমান্ত লইয়া আলোচনা হইয়াছিল এবং কেবল তাহাই নহে, অন্তর্তিব্বত ও চীন এবং অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত লইয়াও আলোচনা হইয়াছিল। ঐ সম্মেলনে ভারত ও তিব্বতের মধ্যকার সীমান্ত লইয়া আলোচনায় চীন সরকার তখন বা পরে কোনো পর্যায়ে আপত্তি করেন নাই। এ পরিস্থিতিতে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ম্যাকমোহন লাইন সম্পর্কে ঐ সম্মেলনে যে-চুক্তি হইয়াছিল, তাহা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আচরণ অনুসারে চীন ও তিব্বত উভয়ের উপর বাধ্যবাধকতামূলক বলিয়াই গণ্য। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তিব্বতের চুক্তি সম্পাদন করিবার ঘটনা এই প্রথম নহে। ১৮৫৬ সালে তিব্বত নিজেই নেপালের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। ১৯০৪ সালে ব্রিটেন ও তিব্বতের দ্বারা স্বাক্ষরিত নিয়মপত্রটি (কনভেনশন) তিব্বতে চীনা আম্বানের সহায়তায় ব্রিটিশ ও তিব্বতী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচিত হইয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন ও তিব্বতের মধ্যে তথাকথিত গোপন-পত্র বিনিময়ের পর দীর্ঘকালের মধ্যে ব্রিটেনের সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র প্রকাশ করিবার সাহস হয় নাই। আপনি আরও বলিয়াছেন যে, ম্যাকমোহন লাইনটিকে "সিমলা সন্ধিপত্রে সংযোজিত মানচিত্রে আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছিল পরে।" আমি কিন্তু আপনার তথ্য কিংবা সিদ্ধান্ত কোনোটির সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছি না। সিমলা সম্মেলনের চীনা প্রতিনিধি ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ম্যাকমোহন লাইন সম্পর্কে ষোলো-আনা অবগত ছিলেন। এই বিশেষ সীমারেখাটি লইয়া আলোচনা হইয়াছিল তিব্বতী ও ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে,

কিন্তু সম্মেলন হইতে উদ্ভূত খসড়া নিয়মপত্রখানি ১৯১৪ সালের ২২শে এপ্রিল ব্রিটিশ-ভারতীয়, তিব্বতী ও চীনা প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবার জন্য উপস্থাপিত হইবার সময় তাহাতে সংলগ্ন মানচিত্রে ম্যাকমোহন সীমারেখা এবং অন্তর্তিব্বত ও চীন এবং অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বতের মধ্যে সীমান্তও দেখান হইয়াছিল। পরে, ১৯১৪ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখের স্মারকলিপিতে চীনের পররাষ্ট্র দপ্তর অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বত এবং অন্তর্তিব্বত ও চীনের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপক্ষীয় সিমলা নিয়মপত্রে সংলগ্ন মানচিত্রে প্রদর্শিত তিব্বত-ভারত সীমারেখা সম্পর্কে তাহাতে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয় না। ইহার পরে, কোনো আপত্তি উত্থাপন না করিয়াই চীনা প্রতিনিধি ২৭শে এপ্রিল নিয়মপত্রে ও মানচিত্রে—উভয়েতেই প্রাথমিক দস্তখত করিয়াছিলেন। পরে, ১৯১৪ সালের ১৩ই জুন তারিখের স্মারকলিপিতে চীনারা অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বত সংক্রান্ত সীমান্তের বিষয়ে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্মারকলিপিতে তিব্বত ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কে আদৌ কোনো উল্লেখ যে করা হয় নাই, ইহা তাৎপর্যসম্পন্ন। একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে, প্রায় পাঁচ বছর পরে, ১৯১৯ সালের ৩০শে মে তারিখে চীনা সরকার আবার সিমলা নিয়মপত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা তুলিয়াছিলেন। এইসকল পরিবর্তন ছিল শুধু অন্তর্তিব্বত ও চীন এবং অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বতের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কে। তিব্বত ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত (ম্যাকমোহন সীমারেখা) সম্পর্কে আদৌ কোনো উল্লেখ ছিল না। পুরানো কাগজপত্র উল্টাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, অন্তর্তিব্বতের মর্যাদা ও সীমান্ত সম্পর্কে একটা মতৈক্য হইবার আশায় ব্রিটিশ সরকার কয়েক বছরের মধ্যে সিমলা নিয়মপত্রখানি প্রকাশ করেন না। আইচিসনের 'ট্রিটিজ'-এর ১৯২৯ সালের সংস্করণে সিমলা-নিয়মপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সরকারি মানচিত্রগুলিতে ম্যাকমোহন সীমারেখা দেখান হয় ১৯৩৭ সাল হইতে। এই সকল মানচিত্র ব্যাপকভাবেই প্রচার করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন বা পরে কখনও চীনা কর্তৃপক্ষ কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

১৯৪৭ সালে লাসার তিব্বতী ব্যুরো ও নূতন ভারত সরকারের মধ্যকার দুইটি বার্তা-বিনিময় হইতে আপনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমি তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করিতেছি। ঘটনা হইল এই যে, লাসায় আমাদের মিশন তিব্বতী ব্যুরো হইতে ১৯৪৭ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখের একটি তারবার্তা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভারত ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী তিব্বতী ভূখণ্ড বলিয়া কথিত ভূখণ্ডগুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ঐ তারবার্তায় বলা হইয়াছিল; সেই ভূখণ্ডগুলি হইল "যেমন, সাইয়ুল ও ওয়ালং এবং গঙ্গানদীর এদিকের পেমাকো, লোনাং, লোপা, মন্, ভুটান, সিকিম, দার্জিলিং ও অন্যান্য স্থানের দিকে এবং ইয়ারখিমের সীমান্ত পর্যন্ত লোবো, লাদাক, ইত্যাদি।" ইহা হইতে দেখা যায় যে, তিব্বত যে এলাকা দাবি করিতেছিল, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ঐগুলিকে আক্ষরিক অর্থে ধরিতে হইলে, তিব্বতের সীমান্ত গঙ্গানদীর রেখা পর্যন্ত চলিয়া আসে। এমন অসম্ভব, আজগুবি দাবি ভারত সরকারের দ্বারা বিবেচিত হইবার যোগ্য ছিল না। ভারত সরকার যদি ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে

পারিতেন যে, পরে উহাকে বৃহৎ বৃহৎ ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর দাবির ভিত্তি করা হইবে, তাহা হইলে উহা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হইত। তেমন কোনো ধারণা ছিল না, তাই ভারত সরকার নিম্নলিখিত মর্মে জবাব পাঠাইয়াছিলেন : "যে-কোনো পক্ষ যে-সকল বিষয় উত্থাপন করিতে চাহেন, সেইসকল বিষয়ে নূতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভিত্তিতেই সম্পর্কটি চালাইয়া যাওয়াই তিব্বতী সরকারের অভিপ্রায়, এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হইলে ভারত সরকার আনন্দিত হইবে। মহামান্যবর সম্রাটের সরকারের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে যেসকল দেশের সঙ্গে ভারতের সন্ধি-চুক্তির সম্পর্ক আছে, অন্যান্য সেই সমস্ত দেশই এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন।" এই জবাব হইতে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সীমান্তের প্রশ্নে তিব্বতের সঙ্গে নূতন চুক্তি সম্পাদন করিবে বলিয়া ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্ত অন্যায্য। ইংরাজরা ক্ষমতা পরিত্যাগ করার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অবিভক্ত ভারতের সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী দায়-দায়িত্বগুলিরও উত্তরাধিকারী হইল। যত দেশের সঙ্গে অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সন্ধি ও চুক্তি ছিল, সেই সমস্ত দেশকে নূতন ভারত সরকার এই আশ্বাস দিতে চাহিয়াছিলেন যে, ঐসকল সন্ধি ও চুক্তি হইতে উদ্ভূত দায়-দায়িত্বগুলি এই নূতন ভারত সরকার মানিয়া চলিবেন। মান্যবর, আপনার পত্রে যে তারবার্তার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার তিব্বতী কর্তৃপক্ষকে শুধু সেই মর্মেই আশ্বাস দিতে চাহিয়াছিলেন, অন্য কিছু নহে। ভারতের দিক হইতে, ভারতীয় ভূখণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ এলাকার উপর দাবিকে আমল দিবার জন্য পুরানো সন্ধি-চুক্তি লইয়া নূতন আলোচনার কোনো প্রশ্ন উঠে না—এমনকি সে-দাবি আলোচনার উদ্দেশ্যেও হইতে পারে না।

ভুটানের পূর্বদিকের সীমান্ত চীনা মানচিত্রে যেভাবে দেখান হয়, তাহাকে চিরাচরিত সীমান্ত বলা ভুল। এই এলাকায় বরং ম্যাকমোহন সীমারেখাই প্রচলিত সীমান্তের সঠিক চিত্রণ। হিমালয়ের শৈলশিরা দিয়া যে-জলবিভাজিকা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক সীমান্ত; উভয়দিকের মানুষ তাহাকেই শত শত বছর যাবৎ সীমান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ম্যাকমোহন সীমারেখার দক্ষিণের অধিবাসী মন্‌বা, আকা, দাফ্‌লা, মিরি, আবোর ও মিশ্‌মি উপজাতিগুলি আসামের অন্যান্য পার্বতী উপজাতির মতো একই জাতিবর্গের; তিব্বতীদের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। তিব্বতীরা নিজেরাই এইসকল উপজাতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাহারা এই সমস্ত উপজাতিকে একত্রে মিলাইয়া বলে—"লোপা"। সত্য বটে, সন্নিহিত দুইটি দেশের অধিবাসীদের জাতি-সূত্র দিয়া দেশ দুইটির মধ্যে সীমান্ত নিরূপণ করা হয় না। সীমান্তের দুই পারের অধিবাসীদের মধ্যে কোনো না কোনো প্রকারের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অস্তিত্বও বিরল নয়। তবু উপরে উল্লিখিত উপজাতিগুলির উপর তিব্বতীদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব যে সামান্যতম মাত্রায়ও পড়ে নাই, তাহা তাৎপর্যপূর্ণ; ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে, তিব্বতী কর্তৃপক্ষ এই এলাকায় কখনও এক্তিয়ার খাটান নাই। অপরপক্ষে, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে এইসকল এলাকা অবধি অগ্রসর হইয়াছে। আকা-দের সঙ্গে ১৮৪৪ ও ১৮৫৩ সালে এবং আবোর-দের সঙ্গে ১৮৬২-৬৩

ও ১৮৬৬ সালে এবং মন্‌বা-দের সঙ্গে ১৮৪৪ ও ১৮৫৩ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর ভারত সরকারের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হইয়াছিল। উপজাতিগুলিকে কম-বেশি পরিমাণে নিজেদের ব্যাপার নিজেদের দেখাশুনা করিতে দেওয়া এবং বাদবাকি ব্রিটিশ-ভারতীয় ভূখণ্ডে যেমন দেখা যায় সেই রকমের বিশদ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই সকল এলাকায় স্থাপন করিবার চেষ্টা না করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের কর্মনীতি। তাহা হইলেও, বিরোধের মীমাংসা করা এবং এই ধরনের উদ্দেশ্য লইয়া ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসারেরা এই সকল এলাকায় যাইতেন। অবশেষে, আয়তনে মোটামুটি ১০,০০০ বর্গমাইল এলাকায় সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চল (ফ্রন্টিয়ার ট্র্যাক্ট) গঠিত হয় ১৯১২ সালে এবং ঐ প্রায় ১০,০০০ বর্গমাইল আয়তনের বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল গঠিত হয় ১৯১৩ সালে, অর্থাৎ সিমলা সম্মেলন বসিবার পূর্বে। ১৯০৬ সালে চাইনীজ ইন্‌ল্যান্ড মিশন লণ্ডনে চীন সাম্রাজ্যের যে ভূচিত্রাবলী (অ্যাটলাস) প্রকাশ করেন, তাহাতে এই এলাকার সীমান্তের যে বিন্যাস দেখান হয় তাহা ও ১৯১৪ সালে সিমলায় স্থিরীকৃত বিন্যাস—দুইই প্রায় একই। ১৯১৩ সালে এলাকাটিতে ব্যাপক জরিপ চালান হইয়াছিল। লোহিত এলাকায় জরিপ করিয়াছিলেন মিশ্‌মি মিশন ১৯১১-১২ সালে; দিভাং উপত্যকায় জরিপ হইয়াছিল ১৯১২-১৩ সালে; আবোর এলাকায় ১৯১৩ সালে। ১৯১৩-১৪ সালে ক্যাপ্টেন বেন্টলি সমগ্র এলাকায় তিব্বতী এক্তিয়ারের দক্ষিণী প্রান্তগুলির ব্যাপক জরিপ করিয়াছিলেন। এই সকল বিশদ তথ্যের ভিত্তিতেই ১৯১৪ সালে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত স্থির করা হইয়াছিল। অতএব, ম্যাকমোহন সীমারেখাটি যে দুর্বল তিব্বতের উপর ভারত সরকারের খামখেয়ালিভাবে চাপাইয়া দেওয়া জিনিস নহে, তাহা স্পষ্ট। ম্যাকমোহন সীমারেখা দিয়া এই এলাকার স্বভাবজ, চিরাচরিত, জাতিগত ও প্রশাসনিক সীমান্তটিকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

১৯১৭ সালে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত একটি মানচিত্র এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ১৯২৯ সালের সংস্করণে প্রকাশিত একটি মানচিত্রের কথা মান্যবর, আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। চীন যে সীমারেখা দাবি করেন, তাহাই সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে দেখান হইয়াছে, কিন্তু একই পত্রে সূচক-মানচিত্রে ম্যাকমোহন সীমারেখাও দেখান হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, চীন সিমলা নিয়মপত্রটিকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিবেন এই আশা করিয়া কেবল ম্যাকমোহন সীমারেখা দিয়া নূতন মানচিত্র প্রকাশ করিতে ব্রিটিশ সরকার চাহেন নাই। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ১৯২৯ সালের সংস্করণের মানচিত্র সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যদিও ইহা সত্য যে, চীন বর্তমানে যে-রেখা দাবি করেন, সীমান্তের পূর্বাংশ মোটামুটি তাহাই দেখান হইয়াছে; তবু একই মানচিত্রে সমগ্র আকসাই চিন্‌কে লাদাকের অংশ হিসাবে দেখান হইয়াছে। অতএব, চীনের দাবির সমর্থনে সীমান্তের একাংশে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার প্রামাণিকতা উদ্ধৃত করিয়া, অপরাংশে তাহা আবার প্রত্যাখ্যান করা অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য দেশের বেসরকারিভাবে প্রকাশিত মানচিত্রের দৃষ্টান্ত সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করিতে হইলে, আমাদের সমর্থনে এমন বহুসংখ্যক মানচিত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি। যেমন, ১৮৭৬ সালে আঁদ্রিভো-কুযোঁ (Andriveau-Cojon) কর্তৃক প্রকাশিত 'আসিয়ে মেরিদিওনেল' (Asie Meridionale) মানচিত্রে এবং একই কোম্পানি দ্বারা ১৮৮১ সালে প্রকাশিত 'আসিয়ে ওরিয়েন্‌তেলে' (Asie Orientale) মানচিত্রে সমগ্র উপজাতীয় এলাকাটিকে তিব্বতের বাহিরে দেখান হইয়াছে। ১৯০৬ সালে চাইনীজ ইনল্যান্ড মিশন চীন সাম্রাজ্যের যে ভূচিত্রাবলী প্রকাশ করেন, তাহাতে সীমারেখা মোটামুটি ম্যাকমোহন সীমান্তরেখারই মতো। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ যুদ্ধ-দপ্তর হইতে চীন সাম্রাজ্যের যে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়, তাহাতে প্রায় সমগ্র উপজাতীয় ভূখণ্ডটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত দেখান হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়া অ্যান্ড টিবেট' নামে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের যে বই ১৯১০ সালে পরকাশিত হয় লণ্ডনে, উহাতে যে মানচিত্র আছে তাহাতে উপজাতীয় এলাকাটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত দেখান হইয়াছে; স্যার চার্লস বেল্‌-এর 'টিবেট পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' (অক্সফোর্ড, ১৯২৪) নামে বইয়ের মানচিত্রেও তাই।

সিকিম ও ভুটানের সীমান্তের বিষয়টি বর্তমান আলোচনার মধ্যে পড়ে না বলিয়া আপনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঠিক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে, চীনের মানচিত্রগুলিতে ভুটানের বড় বড় অংশকেই তিব্বতের অংশ হিসাবে দেখান হয়। ভুটানের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী যে সম্পর্ক তদনুসারে ভুটানের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয় লইয়া অন্যান্য সরকারের সঙ্গে কথা বলিবার একমাত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষ হইলেন ভারত সরকার এবং প্রকৃতপক্ষে ভুটান সরকারের পক্ষ হইতে কতকগুলি বিষয় লইয়া আমরা আপনাদের সরকারের সঙ্গে কথা বলিয়াছি। অতএব, তিব্বতের সঙ্গে ভুটানের সীমান্ত সম্পর্ক চীনা মানচিত্রের ভ্রান্তি সংশোধনের বিষয়টিকে ঐ অংশে ভারত ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যকার সীমান্তের বিষয়ের সঙ্গে একত্রেই আলোচনা করিতে হইবে। সিকিম প্রসঙ্গে—১৮৯০ সালেই চীন সরকার স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "ঐ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উপর প্রত্যক্ষ ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধিকার আছে" ভারত সরকারের। ১৮৯০ সালের এই নিয়মপত্রে সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্তও নির্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং পরে, ১৮৯৫ সালে ঐ সীমান্ত চিহ্নিত হইয়াছিল। এইভাবে দেখা যাইতেছে, তিব্বত অঞ্চলের সঙ্গে সিকিমের সীমান্ত লইয়া কোনো বিরোধ নাই।

আপনি বলিয়াছেন—চীন-ভারত সীমান্ত প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, ইহা সমগ্রভাবেই অনির্ধারিত এবং চীনা মানচিত্রে নহে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় মানচিত্রগুলিতেই চীন-ভারত সীমান্ত একতরফাভাবে অদলবদল করিয়া আসা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, (তিব্বতের সঙ্গে সিকিম ও ভুটানের সীমান্ত বাদ দিয়া) চীন-ভারত সীমান্ত ৩,৫২০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সীমান্তকে পুরোপুরি অনির্ধারিত বলা ভুল। ১৯১৪ সালের সন্ধিপত্রের মানচিত্রে ভুটানের পূর্ব সীমান্ত স্পষ্ট চিহ্নিত আছে। ১৯৫৪ সালের চুক্তিতে ছয়টি গিরিপথের উল্লেখ থাকায়, উহার দ্বারা হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের সীমান্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় মানচিত্রে একতরফাভাবে সীমান্ত অদল-বদল করিয়া আসা হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ, সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘটনা হইল এই যে, তখন জলবিভাজিকা যেখানে ছিল বলিয়া ইংরাজরা মনে করিয়াছিলেন, মোটামুটি সেইখানেই গোড়ার ব্রিটিশ মানচিত্রগুলিতে সীমান্ত দেখান হইত।

পরে, ভূসংস্থান সংক্রান্ত ও জলবিভাজিকা সংক্রান্ত স্থানীয় তথ্য অধিকতর পরিমাণে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী মানচিত্রগুলিতে আরও সঠিকভাবে সীমান্তটি দেখান হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানচিত্রগুলির মধ্যে গরমিলের আরও একটি আংশিক কারণ হইল এই যে, সীমান্তের যথার্থ বিন্যাস নির্বিশেষে ব্রিটিশ মানচিত্র রচয়িতারা তাঁহাদের মানচিত্রে সব সময় প্রশাসনিক সীমান্তই দেখাইতেন। অতএব, সীমান্ত এলাকাগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, পরবর্তী মানচিত্রগুলিতে তদনুযায়ী পরিবর্তন ঘটান হইত। এইভাবে, ১৮৯৫ সালে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া যে ভারতের মানচিত্রে (১ ইঞ্চি—১২৮ মাইল) প্রকাশ করেন, তাহাতে, পরে যাহা ম্যাকমোহন সীমারেখা বলিয়া পরিচিত হয়, সেই অবধি উত্তর বর্মা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাবহির্ভূত এলাকাগুলিকে ফিকা কমলালেবু রঙের দেখান হয়; বাদবাকি ভারতীয় ভূখণ্ডের জন্য ব্যবহার করা হয় এক পৃথক ও আরও গাঢ় রঙ। ১৯০৯ সালে ভারত সরকার ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে যে স্মারকলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে একটি মানচিত্রে সমগ্র উপজাতীয় এলাকাটিকে ভারতের অংশ হিসাবে দেখান হয়। আসল কথা হইল এই যে, ভারতের বর্তমান সীমান্ত বরাবরই ঐতিহাসিক সীমান্ত ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এই সকল সীমান্ত অবধি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার অল্পকাল পরই ভারত সরকার কর্মনীতি হিসাবেই স্থির করিলেন যে, পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধরণ-ধারণ সংরক্ষিত করিয়া এইসকল এলাকা যাহাতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি পাইতে পারে, সেইজন্য সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলিকে আরও বেশি প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। শুধু সম্প্রতি তিব্বতের সংকটের পর এবং বহুসংখ্যক তিব্বতী ভারতে প্রবেশ করিবার পর ভারতীয় ফৌজ সমানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সিতে অগ্রসর হইতে শুরু করে—এই কথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিব্বতে হালের গোলযোগ ঘটিবার পূর্বে কয়েক বৎসর যাবৎ একেবারে ম্যাকমোহন সীমারেখা পর্যন্তই এই এলাকায় সাধারণ ও পুলিশী প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির কোথাও আমাদের কোনো সামরিক শক্তি ছিল না। বেসামরিক লোকলস্করের জন্য ছিল শুধু সশস্ত্র পুলিশ এবং সীমান্তের চৌকিগুলিতে পর্যন্ত এই পুলিশই মোতায়েন ছিল। অধিকতর শক্তিশালী চীনা সামরিক দলের দ্বারা লোংজুতে আমাদের ফাঁড়িটি যখন জয় করিয়া লওয়া হইল এবং সীমান্ত বরাবর অন্যত্র যখন আমাদের লোকলস্কর চীনা বাহিনীর দ্বারা সন্ত্রস্ত হইতেছিল, কেবল তখনই আমরা সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ফৌজের হাতে দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

বছরের পর বছর যে চীনা মানচিত্রগুলিতেই সীমান্তের বিন্যাস অদলবদল করিয়া বৃহৎ বৃহৎ ভারতীয় ভূখণ্ড চীনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলির বক্তব্য হইতে স্পষ্ট হইয়া যাইবার কথা। এমনকি ১৯৪৯ সালের পরে প্রকাশিত চীনা মানচিত্রগুলিতেও কোনো সুনির্দিষ্ট সীমান্ত অনুসরণ করা হয় নাই, তাহাও এখানে বলা দরকার। বিভিন্ন মানচিত্রে সীমান্তের একই অংশের বিভিন্ন বিন্যাস দেখান হয়।

সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবৎ যে অবস্থা রহিয়াছে, তাহা একতরফাভাবে পরিবর্তন করিবার

চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন চীন সরকারই—ইহা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত। বড়াহোতিতে যে চীনা লোকলস্কর রহিয়াছে এবং আকসাই চিন্ এলাকায়, খুর্নাক ফোর্টে, মান্দাসে, স্পাঙ্গুরে, খিঞ্জেমানেতে ও লোংজুতে যে চীনা ফৌজ রহিয়াছে এবং স্টিতি এলাকায়, শিপ্‌কি গিরিপথে, নিলাং-সাধখং এলাকায়, সাংচায়, লাপ্‌থালে ও দিচু উপত্যকায় যে চীনা অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়াছে, তাহার অন্য কোনো অর্থ হয় না। চীনা ফৌজ যে কখনও ম্যাকমোহন সীমারেখা পার হয় নাই, তাহাও ঠিক নয়। খিঞ্জেমানে ও লোংজু উভয় এলাকাই এই সীমারেখার দক্ষিণে অবস্থিত।

সীমান্তের মধ্য অংশে কতকগুলি স্থান ভারত সরকার হালে "নিয়মবিরুদ্ধভাবে দখল করিয়াছেন"—এই অভিযোগ ভারত সরকার সজোরে অস্বীকার করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি চীনা বাহিনীই তর্কাতীতভাবে যাহা ভারতীয় ভূখণ্ড তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহা দখল করিবার জন্য সমানে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। চীনা বাহিনী কর্তৃক অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকারপ্রবেশের চেষ্টার বিশদ বিবরণ সংযোজিত মন্তব্যগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। এইসকল অনধিকার প্রবেশ বিশেষ স্পষ্ট হইয়াছে স্পাঙ্গুর এলাকায়। গত এক বা দুই বছর যাবৎ চীনা বাহিনী সেখানে চিরাচরিত সীমান্ত উপেক্ষা করিয়া আক্রমণমুখী ভঙ্গিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। স্পাঙ্গুর হ্রদের পশ্চিম প্রান্তের নিকটবর্তী যে-স্থানে চীনারা একটি নূতন শিবির স্থাপন করিয়াছে, তাহা কোনো কোনো সরকারি চীনা মানচিত্র অনুসারেও ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত। তিব্বতের সীমান্ত এলাকাগুলিতে চীনা বাহিনীর যে ব্যাপক গতিবিধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের মন্তব্য করিবার বিষয় নহে। আমরা আশা করি, এই সমস্ত গতিবিধি সমগ্র চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর ভারতীয় ভূখণ্ডের ভিতরে ঢুকিবার নূতন কর্মনীতির লক্ষণ নহে।

চীনা কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সিকিম, ভুটান, লাদাক এবং আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি দখল করিবেন বলিয়া তিব্বতে কোনো কোনো চীনা অফিসার বারবার ঘোষণা করিয়াছেন—এই মর্মে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। জানি না কোন্ ক্ষমতাবলে তাঁহারা এই রকমের মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এইসকল মন্তব্য স্বভাবতই সীমান্তে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাই এ বিষয়ে আমি মান্যবর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কোনো কোনো ভারতীয় লোকলস্করের চীনা ভূখণ্ডে অনধিকারপ্রবেশের কথা মান্যবর আপনি বলিয়াছেন। আমাদের লোকলস্কর কোথাও এমন কাজ করে নাই। সুদূর প্রসারিত কোনো সীমান্ত অঞ্চলের জনমানবহীন ঊষর স্থানের কোনো কেন্দ্রে তাহারা যদি বিচারের ভুলে এমন কাজ করিয়াও থাকে, প্রতিবিধানের জন্য বন্ধু সরকার তাহাতে চটপট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। তাহা না করিয়া, গত বছর লাদাকে হাজি লঙ্গরের নিকটে একটি ভারতীয় কর্মীদল নিয়মিত প্রশাসনিক টহলদারি করিবার সময় আপনাদের বাহিনী তাহাদের গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে আমরা আপনাদের নিকট খোঁজ লইবার পূর্বে ঐ গ্রেপ্তারের বিষয় আমাদের জানান হয় নাই। ইতিমধ্যে আমাদের লোকলস্করকে ভয় দেখান হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হইয়াছে এবং কঠোরভাবে জেরা করা হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই কোনো বন্ধু সরকারের লোকলস্করের সঙ্গে আচরণের বিধি নহে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকাগুলিতে ভারত সশস্ত্র তিব্বতী বিদ্রোহীদিগকে আগলাইয়া আসিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক; এই অভিযোগ আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। তিব্বতী বিদ্রোহীরা সীমান্ত পার হইয়া ভারতীয় ভূখণ্ডে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের লোকলস্কর তাহাদের নিরস্ত্র করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সীমান্ত এলাকা হইতে বেশ দূরে সরিয়া আসিবার জন্য জোর দিয়া বলিয়াছে। যে অল্প কয়েকজন তাহা না করিবার ঝোঁক দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা ভারতে আশ্রয় পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে আমাদের ভূখণ্ড ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় বিমান এই এলাকায় বারবার চীনা আকাশ-ভাগ লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা একটুও সত্য নয়। চীনা আকাশ-ভাগে অনধিকার প্রবেশ এড়াইয়া চলিবার জন্য সশস্ত্র বিমানের উপর আমরা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়াছি এবং তাহা সযত্নে পালিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। তবে, সীমান্তবর্তী ফাঁড়িতে সরবরাহ নিক্ষেপ করিবার কাজে ব্যাপৃত বিমান অকস্মাৎ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হইতে পারে, কিংবা যথার্থই সীমান্ত অতিক্রম না করিলেও তাহা করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, এ কথা আপনি যথোচিত মূল্য দিয়া বুঝিবেন। গত জুলাই মাসে লোংজুতে আমাদের ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, প্যারাসুটে করিয়া ডাক্তার নামাইব বলিয়া আমরা আপনার সরকারকে জানাইয়াছিলাম—ইহা হইতে স্পষ্ট হইবে যে, চীনা আকাশ-ভাগ মানিয়া চলিতে আমরা সচেষ্ট ছিলাম। সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির উপর উড়িতে গিয়া আমাদের বিমানখানি বিচারের ভুলে চীনা ভূখণ্ডে গিয়া পড়িলেও আপনারা যাহাতে ভুল না বোঝেন, তাহা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা আপনার সরকারকে খবর দিয়াছিলাম। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়েক মাস যাবৎ সীমান্তে আমাদের বিমানযোগে জরিপকার্য চালান হইবে বলিয়াও ঐ একই কারণে আমরা আপনাদিগকে পূর্বাহ্নে সংবাদ দিয়াছিলাম। প্রসঙ্গত বলিতেছি—চীনা ভূখণ্ডে আমরা চুপিচুপি একটা ফাঁড়ি বসাইয়াছিলাম বলিয়া কোনো কথা তোলা হইলে বলিতে হয় যে, লোংজু সম্পর্কে আমরা আপনাদিগকে যে তথ্য দিয়াছিলাম তাহা হইতে ঐ কথা ভুল প্রমাণিত হয়। আমরা চুপিচুপি ফাঁড়ি বসাইলে, উহার অবস্থান আপনার সরকারকে জানাইতাম না।

ভারতীয় মানচিত্রগুলিতে অঙ্কিত সীমান্ত দিয়া বহু স্থানে ম্যাকমোহন সীমারেখা অপেক্ষাও বেশি ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু ঐ অভিযোগের কোনো ভিত্তি খুঁজিয়া পাই নাই। ভারতীয় মানচিত্রে মিগিতুন এলাকায় যেভাবে চীন-ভারত সীমান্ত দেখান হইয়াছে, তাহা সন্ধিপত্রে সংযোজিত মানচিত্রের সীমান্ত হইতে সামান্য পৃথক; আপনি যদি সেই কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবস্থাটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। সিমলা সম্মেলনের সময় ব্রিটিশ ও চীনা প্রতিনিধির মধ্যে যাহা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সীমান্ত হইবার কথা, তবে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে এই ব্যবস্থা ছিল যে মিগিতুন (এবং আরও কয়েকটি স্থান) তিব্বতী ভূখণ্ডের মধ্যেই পড়িবে। সারি সারপা ও সো কারপো হ্রদ

দুইটি পূত এবং তিব্বতীয়দের তীর্থস্থান; মিগিতুন গ্রাম হইতে তীর্থযাত্রা শুরু হয়—তাই এই স্থানগুলিকে তিব্বতের মধ্যে ফেলিবার জন্য উহা করা হইয়াছিল। সিমলা নিয়মপত্র রচনাকালে এই এলাকার সঠিক ভূসংস্থান জানা ছিল না। পরে, এলাকাটির ভূসংস্থান সঠিকভাবে নিরূপিত হইলে, যেখানে মিগিতুনকে তিব্বতী ভূখণ্ডের মধ্যে রাখা দরকার সেস্থানে প্রয়োজনীয় বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে অন্যত্র যথার্থ সীমান্তটি ভূসংস্থানঘটিত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই হইয়াছে। অতএব, ভারতীয় মানচিত্রগুলিতে প্রকৃত সীমান্ত যেভাবে দেখান হইয়াছে, তাহাতে ঐ এলাকায় সন্ধি-চুক্তিসংলগ্ন মানচিত্রটিকে শুধু সুনির্দিষ্ট ভূসংস্থানের ভিত্তিতেই তৈরি করা হইয়াছে। ইহা করা হইয়াছে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আচরণ অনুসারে।

সীমান্তে যে উত্তেজনার অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহা ভারতীয় অনধিকার প্রবেশ ও প্ররোচনার ফলেই ঘটিয়াছে বলিয়া আপনার যে-মত, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত আমি পোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে, সংযোজিত মন্তব্য-লিপি হইতে দেখা যাইবে, সম্প্রতি কয়েক বছরে কতকগুলি স্থানে চিরাচরিত সীমান্ত পার হইয়া ভারতীয় ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে চীনারাই। আপনি বলিয়াছেন যে, ভারতে আমরা তথাকথিত দ্বিতীয় চীন-বিরোধী (প্রচার) অভিযান চালাইতেছি। আমি তো বলিতে পারি, ইহা হইল প্রকৃত অবস্থার ঠিক বিপরীত। আমাদের দুই দেশের সীমান্তে দুঃখজনক ঘটনাবলী সত্ত্বেও, ভারতে আমরা খুবই সংযত আচরণ করিয়াছি। কতকগুলি স্থানে আপনাদের ফৌজ বিপজ্জনক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে; অন্যান্য স্থানে তাহারা আমাদের ভূখণ্ডেই চলিয়া আসিয়াছে। এই রকমের ঘটনাগুলি ভারতের অখণ্ডতার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অত্যন্ত গুরুতর; কিন্তু আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধে যাহাতে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিয়া আমরা বিচার-বিবেচনা করিয়াই ঐ সকল ঘটনা প্রকাশ করা এড়াইয়া চলিয়াছি। তবে, পার্লামেন্টে প্রশ্নের জবাব দিতে হইয়াছে এবং তথ্য অপ্রকাশ রাখা যায় নাই। এইভাবে তথ্য যখন জানাজানি হইল, তখন পার্লামেন্টে ও জনসাধারণের মধ্যেও হতাশা ও প্রবল ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া ঘটিল। আরও আগে এই সকল ঘটনা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া পার্লামেন্টে ও সংবাদপত্রেও আমাদের সরকারের সমালোচনা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে পার্লামেন্টই সর্বোচ্চ সংস্থা। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও রহিয়াছে; সরকার প্রকাশ্য সমালোচনা সংযত করিতে পারেন নাই। এ পরিস্থিতিতে যদি অভিযোগ করা হয় যে, ভারত সরকার কোনোক্রমে চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইবে পরিস্থিতির তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বক্তব্য। অধিকন্তু, ভারত সরকার, পার্লামেন্ট ও সংবাদপত্র যে সংবিধানগত পদ্ধতিতে কাজ করে, সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই ঐ অভিযোগ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রকমের অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক।

আমি আগে বলিয়াছি এবং আবার বলিতে চাই যে, চীনের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখাটাকে ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পঞ্চশীলের মনোভাব লইয়াই সে-সম্পর্ক বজায় রাখিতে ভারত সরকার এ যাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে গেলে, ঐ পঞ্চশীল সংজ্ঞাবদ্ধ হইবার পূর্বেও উহাই ছিল বরাবর ভারতের কর্মনীতি। অতএব, ভারতীয় ভূখণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ এলাকা, যেখানে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের বসবাস রহিয়াছে এবং যাহা বহু বৎসর যাবৎ ভারতীয় প্রশাসনিক, এক্তিয়ারের অধীন, তাহার উপর চীন এখন দাবি করিল বলিয়া তাহা আমাদের পক্ষে আরও বেশি দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয়। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ এলাকা, যাহা তাহার ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া কোনো সরকারের পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব নহে। তবে, আমরা মানি যে, ৩,৫০০ কিলোমিটারের বেশি প্রসারিত যে ভারত-চীন সীমান্ত, তাহার ভূমিখণ্ড চিহ্নিত হয় নাই। কাজেই, চিরাচরিত সীমান্ত বরাবর কোনো কোনো স্থানে ঐ সকল স্থান চিরাচরিত সীমান্তের তিব্বতীয় অংশের দিকে, না, ভারতীয় অংশের দিকে, তাহা লইয়া বিরোধ দেখা দিতে পারে। অতএব, ইতিমধ্যে, যেসকল সীমান্ত-বিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহা যে সৌহার্দ্যের মধ্যে এবং শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে আমরা একমত। যতক্ষণ না মীমাংসা হইতেছে, ততক্ষণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে হইবে, তাহাতেও আমরা রাজি। ইতিমধ্যে, উভয়পক্ষকে চিরাচরিত সীমান্ত মানিয়া চলিতে হইবে এবং কোনো পক্ষ কোনোক্রমে স্থিতাবস্থা রদবদল করিবার চেষ্টা করিবেন না। অধিকন্তু, চিরাচরিত সীমান্ত পার হইয়া কোনো পক্ষ যদি অপরের ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই পক্ষকে অবিলম্বে সীমান্তের নিজ পারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারত সরকারের দিক হইতে বলিতে পারি, ভারত সরকারের প্রশাসনিক, পুলিশী বা সামরিক কোনো লোকলস্কর বর্তমানে কোথাও চিরাচরিত সীমান্তের তিব্বতী অংশের দিকে নাই। একমাত্র তামাদেনে কয়েক মাস পূর্বে একটি ফাঁড়ি বসান হইয়াছিল। পরবর্তী তদন্তে দেখা গেল যে ইহা ম্যামোহন সীমারেখার কিছুটা উত্তরে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা ঐ ফাঁড়িটিকে ইতিমধ্যে সীমারেখার দক্ষিণে একটি স্থানে অপসারিত করিয়াছি। অতএব, অন্য কোনো স্থল হইতে কোনো ভারতীয় লোকলস্কর অপসারণ করিবার কোনো প্রশ্ন থাকিতে পারে না। এখন আমাদের অনুরোধ এই যে, একই মনোভাব অবলম্বন করিয়া আপনাদের সরকারও স্পাঙ্গুর, মান্দাল ও পূর্ব লাদাকে আরও দুই-একটি স্থানে সম্প্রতি কয়েক মাসে স্থাপিত কতকগুলি ফাঁড়ি হইতে আপনাদের লোকলস্কর অপসারিত করুন। তেমনি, ২৬শে আগস্ট আপনাদের ফৌজ বলপূর্বক যে লোংজু দখল করিয়াছিল এবং এখনও যাহা দখল করিয়া আছে, সেই লোংজু হইতেও আপনাদের ফৌজ অপসারিত হওয়া উচিত। চিরাচরিত সীমান্তের ভারতীয় পাড়ে যেসকল চৌকি চীনা ফৌজের হাতে রহিয়াছে, সেইগুলি আগে ছাড়িয়া যাওয়া না হইলে এবং ভীতিপ্রদর্শন ও সন্ত্রাসন অবিলম্বে বন্ধ না হইলে কোনো আলোচনা ফলপ্রসু হইতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, এত খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করিয়া এত দীর্ঘ পত্র লিখিতে হইল বলিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু, আপনার ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রখানি যে আমাদের পক্ষে মহা আঘাত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমি খোলাখুলিই বলিব। প্রথম যে-দেশগুলি চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়াছিল, তাহার একটি হইল ভারত এবং গত দশ বৎসর যাবৎ আপনাদের দেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া তাহা দৃঢ়তর

করিবার জন্য আমরা সমানে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। ১৯৫৪ সালে তিব্বত এলাকা সম্পর্কে যখন আমাদের দুই দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করিল, তখন আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ভারত ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কের দিক দিয়া ইতিহাস যেসকল প্রধান প্রধান সমস্যা আমাদের উপর দিয়া গিয়াছিল, তাহার শান্তিপূর্ণ চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। পাঁচ বছর পরে আপনি এখন পূর্ণ জোর দিয়া যে-সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার নিকট সম্প্রতি কয়েক বছরে আমরা যাহাকিছু আলোচনা করিয়াছি এবং যাহাকিছু মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই সকলেরই গুরুত্ব অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। চীন তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তটিকে শান্তি ও মৈত্রীর সীমান্ত হিসাবে দেখে বলিয়া আপনি যে-কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি যথোচিতভাবে গ্রহণ করি। যাহা মূলত সীমান্ত-বিরোধ, তাহার মধ্যে যাহা ভারতীয় ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং আছে এমন হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকার উপর দাবি উত্থাপন না করিলে, তবেই ঐ আশা ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতে পারে।

বিনীত শ্রদ্ধাসহ,

আপনার একান্ত

(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু

১৯৫৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পত্রের সংযোজন

সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য-লিপি

(ক) আক্‌সাই চিন্

পত্রে দেখান হইয়াছে, আক্‌সাই চিন্ লাদাকের একটি অংশ। চীন সরকার এখন স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৫৬ সালে তাঁহারা তিব্বত হইতে সিন্‌কিয়াং পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছেন; উহার প্রায় একশত মাইল এই ভূখণ্ডের মধ্যে পড়িয়াছে। এই সড়কটি নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করা হইয়াছিল। পরের বছর ভারতীয় লোকলস্কর নিয়মিত টহলদারিতে গিয়া উত্তর-পূর্ব আক্‌সাই চিন্-এর হাজি লাঙ্গারের নিকটে গ্রেপ্তার হন; তাঁহাদিগকে সুগেৎ কারোলে লইয়া গিয়া পাঁচ সপ্তাহ আটক রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় টহলদার দলটির নেতাকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয় এবং সমস্ত দলিলপত্র আটক করা হয়। রাস্তা নির্মাণের অর্থ ইহাই যে, আমাদের ভূখণ্ডের উপর গুরুতর ও নিরবচ্ছিন্নভাবে দখল নেওয়া হইয়াছে। এই কাজের প্রতিবাদ জানাইয়া আমাদের সরকার জানিতে চাহেন যে, টহলদার দলটি সম্পর্কে চীনা কর্তৃপক্ষ কিছু জানেন কিনা, তখন ভারতীয় দলটিকে আটক করিবার কথা চীনা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন। দলটিকে পরে কারাকোরাম গিরিপথে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) পাংগং এলাকা

এই অঞ্চলে লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে প্রচলিত সীমান্তের অবস্থান হইল ল্যানাক্ লা (৩৪° ২৪" উত্তর ও ৭৯° ৩৪" পূর্ব) হইতে চাং চেন্‌মো-র পূর্ব ও দক্ষিণ জলাশ্রয় বরাবর এবং উহার পরে চুমেসাং-এর দক্ষিণ পার ও চাংলুং লুংপা-র পূর্ব পার বরাবর। পাংগাং সো-র পূর্বার্ধের পশ্চিম প্রান্ত বেড়িয়া সীমান্তটি তাহার পর আং জলাশ্রয় ধরিয়া গিয়া, স্পাঙ্গুর সো-র ভিতর দিয়া গিয়া সিন্ধু নদের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর জলাশ্রয় ধরিয়া গিয়াছে। হালের কয়েক বছরে সশস্ত্র চীনা লোকলস্কর কয়েক স্থানে এই সীমান্ত পার হইয়া ছড়াইয়া আসিয়া বে-আইনিভাবে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে। ভারতীয় সীমান্ত হইতে প্রায় দেড় মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত খুর্নাক দুর্গের উপর চীনা দখলের বিরুদ্ধে ভারত সরকার ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতেই এই দুর্গটি লাদাকের মধ্যে এবং কখনও উহা বিরোধের বিষয়বস্তু হয় নাই। ১৯২৪ সালে তিব্বত ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি এবং একজন ব্রিটিশ কমিশনার লইয়া এই এলাকার কোনো কোনো গোচারণভূমি সংক্রান্ত সম্মেলনেও এই দুর্গটির উপর ভারতীয় এক্তিয়ারের বিরুদ্ধে কথা উঠে নাই। তবে, ভারত সরকারের মন্তব্য-লিপির কোনো জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

একটি চীনা সশস্ত্র সৈন্যদল পাংগং হ্রদের দক্ষিণে স্পাঙ্গুর এলাকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্পাঙ্গুরে একটি শিবির স্থাপন করে বলিয়া ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে জানা গিয়াছিল। খুর্নাক যাইবার পথে একটি ভারতীয় পুলিশ দল উহাদের নিকটবর্তী হইলে ঐ পুলিশ দলটিকে তাহারা পরাভূত করে। ভারত সরকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু চীন সরকারের জবাবে বলা হইয়াছিল যে, উহা চীনা ভূখণ্ড। এমনকি, চীনা মানচিত্রেও এই অংশে সীমান্তের যে-বিন্যাস দেখান হয়, তাহাতেও এই কথা খণ্ডিত হয়—যেমন, চীন প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক এলাকাগুলির মানচিত্রে (১৯৪৮) সীমান্তটি স্পাঙ্গুর হ্রদের পূর্ব প্রান্তের ভিতর দিয়া গিয়াছে। হ্রদটির পশ্চিম প্রান্তে স্পাঙ্গুর অবস্থিত। ভারত সরকার যদিও ন্যায়ত এই চীনা শিবিরটিকে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন, তবু, চীনারা নিজেরাই অপসৃত হইবে এই আশায় ভারত সরকার তাহা করিতে বিরত থাকিয়াছেন।

(গ) দেম্‌চক

দেম্‌চক বা পারিগাস্ হইল আরও একটি এলাকা, যাহা ভারত নাকি "আক্রমণ করিয়া দখল করিয়াছে"। ইহা হইল দক্ষিণ-পূর্ব লাদাকের হান্‌লে অঞ্চলের একাংশ। ১৭শ শতকের লাদাকী ঘটনাপঞ্জীতে এবং ১৮শ ও ১৯শ শতকের পর্যটকদের বিবরণ হইতে—এই সমস্ত সূত্র হইতে বলা হয় যে, দেম্‌চক ছিল লাদাকের অংশ। কৈলাস পর্বতশ্রেণী হইল সিন্ধুনদের পূর্ব জলাশ্রয়; ঐ কৈলাস দেম্‌চকের পূর্বে অবস্থিত। স্ট্র্যাচি ১৮৪৭ সালে এই এলাকায় গিয়াছিলেন; তিনি উহা অনুমোদন করেন এবং স্ট্র্যাচির প্রামাণ্য সূত্রের ভিত্তিতে ওয়াকার দেম্‌চক গ্রামের পূর্বদিক দিয়া এই অঞ্চলের সীমান্ত দেখাইয়াছিলেন। দেম্‌চক ও কৈলাস পর্বতশ্রেণীর অন্তর্বর্তী গোচারণভূমিগুলিকে ভারতীয় গ্রামবাসীরা দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। বর্তমান শতকে রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই এলাকায় ট্যাক্স আদায় করিতেন জম্মু ও কাশ্মীরের সরকার এবং কয়েক দশক যাবৎ এই এলাকায় একটি নিয়ন্ত্রণ-ফাঁড়ি বজায় রাখা হয়।

(ঘ) স্পিতি এলাকা

চুভা ও চু-যে-তে অর্থাৎ পাঞ্জাব রাজ্যের এলাকায় ভারতীয় "আক্রমণের" অভিযোগ করা হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের পত্রে। স্পিতি উপত্যকা কিন্তু চিরাচরিত ভারতীয় ভূখণ্ড। পারে চু ও স্পিতি নদী-ব্যবস্থার অন্তর্বর্তী প্রধান জলাশ্রয়ই এই এলাকায় সীমান্ত। ১৮৭৯ সালে—এতকাল পূর্বেই—ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া যে "হুণ্ডেস বা ন্‌গারি খোরসুম ও অন্যের মানচিত্র" প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জলাশ্রয় বরাবর সীমান্ত দেখান হয়। ১৯৫৬ সালে একটি চীনা জরিপ দল এই এলাকায় গিয়া ভারতীয় ভূখণ্ডে সীমান্ত-নির্দেশক প্রস্তর স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে একটি চীনা টহলদার দলকে সেখানে লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ভারতীয় ভূখণ্ড অতিক্রমণের এইসকল ঘটনার প্রতি ভারত সরকার চীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চীনা কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকারও করেন নাই, আবার, এই এলাকাটিকে তিব্বতের অংশ বলিয়া দাবিও করেন নাই। এই ভূভাগ সম্পর্কে তাঁহাদের সঠিক কিছু জানা ছিল বলিয়াও

মনে হয় নাই, কেননা, তাঁহারা ভারতের নিকট দ্রাঘিমা সংক্রান্ত তথ্য চাহিয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের একটি দেওয়াল মানচিত্রে (হিয়া কুয়াং প্রকাশক সমিতি) এই এলাকাটিকে ভারতের অভ্যন্তরে দেখান হয়। এই এলাকায় ভারতীয় আক্রমণের কথা বলা হইলে, খুব কম করিয়া বলিলেও বলিতে হয় যে, ইহা বিস্ময়কর।

(ঙ) শিপ্‌কি গিরিপথ

১৯৫৪ সালের চুক্তিতে যে-ছয়টি সীমান্ত গিরিপথের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটি হইল শিপ্‌কি গিরিপথ। ইহা চিরকালই ভারতীয় ভূখণ্ডের সীমা। সমস্ত পুরানো মানচিত্রে ইহাকে সীমান্ত গিরিপথ হিসাবে দেখান হয়। ভারত সরকার এই স্থান অবধি একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বহু বছর যাবৎ চালু রাখিয়াছেন; এবং গিরিপথটির ডাইনে একটি শিলায় "হিন্দুস্থান—তিব্বত" এই কথা দুইটি ১৯৫৪ সালে খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে গিরিপথটির ভারতীয় পারে, ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ কিছুটা অভ্যন্তরে, একটি চীনা টহলদার দলকে দেখা গিয়াছিল। ফিরিয়া যাইতে বলা হইলে চীনা লোকলস্কর ঢিল ছুঁড়িয়াছিল এবং হাতবোমা ছুঁড়িবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। চীনা টহলদার দলটির পরিচালক বলিয়াছিল যে, হুপ্‌সাং খুদ্ অবধি এলাকায় টহল দিবার জন্য তাহার উপর নির্দেশ আছে এবং ভারতীয় দলটি হুপ্‌সাং খুদ্ ছাড়াইয়া গেলে সে "অস্ত্রের সাহায্যে বাধা দিবে"। শিপ্‌কি গিরিপথ হইতে চার মাইল দূরে ভারতীয় পারে হুপ্‌সাং খুদ্ অবস্থিত। এই অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে চীন সরকারের নিকট ভারতের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, তাহার কোনো জবাব পাওয়া যায় নাই।

(চ) নিলাং-যাধাং এলাকা

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই বলিয়াছেন, সীমান্তের যে অংশ লাদাক ও নেপালের অন্তর্বর্তী, তাহার বহু স্থান লইয়া ঐতিহাসিক বিরোধ রহিয়াছে এবং তিব্বতে সাপারাং জং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ সাং ও সুংশা এলাকাটিকে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই একটিমাত্র এলাকা লইয়াই চীনা কর্তৃপক্ষ বিতর্ক তুলিয়াছেন। সাং হইল যাধাং গ্রাম, সুশাং হইল নিলাং গ্রাম এবং সাপারাং জং হইল তিব্বতের এই অংশের জিলা সদর। নিলাং-যাধাং এলাকায় পুলিং-সুমদো বা পুলাম সুম্‌দা নামে একটি গ্রাম আক্রমণ করিয়া দখল করা হইয়াছে বলিয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়াছেন।

এই এলাকাটি বরাবরই চীনের ছিল এবং মাত্র ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ইহা দখল করিয়াছিল—ইহা সত্য নহে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ নিলাং ছিল বুশাহ্‌র রাজ্যের (বর্তমান ভারতের হিমাচল প্রদেশ) অংশ। ১৬৬৭ সালে বুশাহ্‌র ও তেহ্‌রির মধ্যে একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সন্ধি-চুক্তির ও নিলাংকে তেহ্‌রিতে ছাড়িয়া দিবার বিবরণ পাওয়া যায় একটি তাম্রশাসনে। কাজেই, স্পষ্টতই নিলাং তখন ভারতে ছিল। ১৮শ শতকের দলিলে দেখা যায় যে, তেহ্‌রি তখন ঐ এলাকাটির প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাইত। এই এলাকার অধিবাসীরা গাড়োয়ালী বর্গের—তিব্বতী বর্গের নহে।

১৮০৪ সালে নেপালী সৈন্যেরা নিলাং গ্রামটিকে ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়,

কিন্তু ১৮৫০ সালে তেহ্‌রি দরবার নিলাং গ্রামটিকে এবং আরও উত্তরে যাধাং নামে একটি পল্লী পুনঃস্থাপন করেন। ১৯১৪ সালে তিব্বতীরা নিলাং-এর দক্ষিণে গুম গুম নালায় একটি সীমান্ত-নির্দেশক স্তম্ভ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং চার বছর পরে আবার তেহ্‌রি দরবার সাংচক্ লা সীমান্ত গিরিপথে তিনটি সীমান্ত-নির্দেশক স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল।

১৯২৬ সালে তিব্বতী, তেহ্‌রি ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি সীমান্ত কমিশন নিলাং-এ মিলিত হন। নিজেদের অনুকূলে তেহ্‌রি সরকার বেশকিছু প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণের মধ্যে ছিল—ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব, রাস্তা এবং পাকা বাড়ি নির্মাণের প্রমাণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভূমি-রাজস্ব আদায় করিবার প্রমাণ। তিব্বতীরা একটিমাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন; তাহা হইল এই যে, তিব্বতের বাণিজ্যের উপর একটা কর ধার্য হইত—সেই কর তাঁহাদের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে আদায় করিতেন। এলাকাটি তেহ্‌রি দরবারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনই থাকে এবং ১৯৪৮ সালে তেহ্‌রি রাজ্যটি উত্তর প্রদেশে (ভারত) সংযুক্ত হইবার পর উহা উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীন থাকে। ১৯৫১ সাল হইতে এইসকল গ্রামবাসী তিব্বতীদের আদৌ কোনো কর দেয় নাই, কেননা, বাণিজ্যের জন্য তিব্বতে যাওয়া তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে।

১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তিতে যে-ছয়টি সীমান্ত গিরিপথ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি এই অঞ্চলের প্রধান জলাশ্রয়-বরাবর অবস্থিত; এবং নিলাং-যাধাং এলাকাটি ঐ প্রধান জলাশ্রয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে দেখা গেল যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, কিছু সশস্ত্র চীনা লোকলস্কর এই এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯৫৬ সালের ২রা মে ভারত সরকার একটি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে চীন সরকারের কোনো জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

(ছ) বড়া হোতি

বড়া হোতি হইল উত্তর প্রদেশ রাজ্যের (ভারত) একটি ক্ষুদ্র এলাকা (প্রায় দেড় বর্গ মাইল); চীনারা ইহাকে বলে উ-জে এবং ভারত সরকার উহা দখল করিয়াছেন বলিয়া চীনারা অভিযোগ করেন। এই অংশে সীমান্ত হইল শতদ্রু ও অলকানন্দার প্রধান জলাশ্রয় এবং বড়া হোতি এলাকাটি ঐ জলাশ্রয় ও আরও দক্ষিণে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৈলশিরার অন্তর্বর্তী। ১৯শ শতকের রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রে এবং অন্যান্য দলিলপত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই এলাকায় জলাশ্রয়ই হইতেছে ভারত ও তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে সীমানা। জরিপের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের মানচিত্র প্রথম রচিত হইয়াছিল ১৮৫০ সালে; তখন হইতে ইহা ভারতীয় মানচিত্রে দেখান হয়। এমনকি, ১৯৫৮ সাল অবধি চীনা মানচিত্রেও জলাশ্রয়কেই সীমান্ত হিসাবে দেখান হয়। বড়া হোতি জলাশ্রয়ের দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই, উহাকে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ১৯৫৪ সাল অবধি তিব্বতীরাও বিশেষ কোনো আপত্তি জানান নাই, চীনারাও না; কিন্তু তখন হইতে চীনা লোকলস্কর সমানে এই এলাকায় আসিয়াছে। এই বিষয়টি লইয়া

বিবেচনার জন্য ১৯৫৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে দিল্লীতে একটি সম্মেলন হইয়াছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যতদিন বিরোধের মীমাংসা না হইতেছে, ততদিন এই এলাকায় যেন কোনো সশস্ত্র লোকলস্কর পাঠান না হয়। চীন সরকার ইহাতে সম্মত হন, কিন্তু কোন পক্ষই বেসামরিক লোকলস্কর পাঠাইবেন না বলিয়া আরও যে প্রস্তাব ছিল, তাহা চীন সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব, এই এলাকায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক এক্তিয়ার খাটাইবার জন্য ভারত সরকার এই এলাকায় বেসামরিক লোকলস্কর পাঠাইয়াই চলিয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বড়া হোতি একজন 'পাটোয়ার'-এর অধীন এবং গাড়োয়াল জেলার কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবেই সেখানে সফর করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিকে চালাইয়া যাইবার ব্যাপারটাকে "আক্রমণ" বলা হইলে তথ্যবিকৃতিই ঘটে। অভিযোগটি বরং চীন সরকারের বিরুদ্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য; তাঁহারা বেসামরিক লোকলস্কর পাঠাইয়াছেন এবং কেবল তাহাই নহে, দিল্লী সম্মেলনের চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা ১৯৫৮ সালে একটি সশস্ত্র দলও এই এলাকায় পাঠাইয়াছিলেন। সশস্ত্র লোকলস্কর না পাঠাইবার ব্যবস্থাটি ভারত সরকার সযত্নে মানিয়া আসিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদিগকেও অস্ত্র রাখিতে দেন নাই। অধিকন্তু, সাধারণ আচরণের বিরুদ্ধে গিয়া, চীনা লোকলস্কর ১৯৫৮ সালের শীতকালেরও এক ভাগে বড়া হোতিতে অবস্থান করে।

এলাকাটিতে বেসামরিক লোকলস্করও না পাঠাইবার জন্য সম্মেলনে ভারত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার স্বার্থে ভারত কতদূর যাইতে ইচ্ছুক। চীনা পক্ষ হইতে প্রধান যুক্তি তোলা হইয়াছিল একটিমাত্র; তাহা হইল এই যে, 'সারজি' নামে এক প্রকার তিব্বতী প্রতিনিধি এই এলাকায় কর আদায় করিবার জন্য মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। তবে, ইঁহারা চীন সরকারের নিয়মিত কর্মকর্তা নহেন; তাঁহারা শুধু বাণিজ্যের সহায়ক—ভারতীয়-তিব্বতী বাণিজ্য আরম্ভ হইবার ঘোষণা করিবার জন্য এবং তিব্বত হইতে আগত বা তিব্বতগামী গো-মহিষাদি পশু রোগাক্রান্ত কিনা তাহা তদারক করিবার জন্য তাঁহারা আসেন। যেসকল তিব্বতী বাণিজ্য করিতে আসেন, কেবল তাঁহাদের নিকট হইতেই উঁহারা কর আদায় করেন; স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাঁহারা কর আদায় করেন না। তবে, তিব্বতী 'সারজি'-দের এই রকমের আগমনের বিরুদ্ধেও ভারত সরকার বরাবর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫৮ সালের দিল্লী সম্মেলনে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, উষে বলিতে কোন্ এলাকাটিকে বুঝান হয়, তাহাও চীনারা জানিতেন না। কাজেই তাঁহারা স্থানীয় তদন্তের জন্য জিদ করিয়াছিলেন, কেননা, তাহা হইলে কোন্ এলাকার উপর দাবি করা হইতেছে, সেটা তাঁহারা জানিতে পারিবেন।

বড়া হোতি-র দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আরও দুইটি স্থান ভারত কর্তৃক "আক্রান্ত ও অধিকৃত" বলিয়া প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে; ঐ স্থান দুইটি হইল—সাংচা বা সাংচা মাল্লা এবং লাপ্‌থাল। বাল্‌চা ধুরা গিরিপথের ভারতীয় দিকে, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জিলায় ঐ স্থান দুইটি অবস্থিত। এই এলাকায় ভারত ও তিব্বতের মধ্যে চিরাচরিত সীমান্ত হইল জল-বিভাজিকা; সেই জল-বিভাজিকার উপর এই গিরিপথটি অবস্থিত। এডউইন অ্যাট্‌কিন্‌সনের 'দি হিমালয়ান ডিস্‌ট্রিক্টস্ অব্ নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অব্ ইণ্ডিয়া (১৮৮৬)' নামে গ্রন্থে ইহা অনুমোদিত হয়। সাংচা মাল্লা সীমান্ত হইতে দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং লাপ্‌থাল ছয় মাইল দক্ষিণে। চীনের কোনো মানচিত্রে এই স্থানগুলিকে তিব্বতের অভ্যন্তরে দেখান হয় নাই এবং তিব্বত বা চীন পূর্বে কখনও স্থানগুলির উপর দাবি জানান নাই। মাত্র ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, শীত আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ-ফাঁড়িগুলি যথারীতি ফিরিয়া আসিলে, চীনা লোকলস্কর ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং এই দুই স্থানে ফাঁড়ি বসায়। ১৯৫৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকার যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোনো জবাব পাওয়া যায় নাই।

(জ) ইয়াশের, খিঞ্জেমানে ও শাৎজে

ভারতীয় ফৌজ ইয়াশেরে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল এবং এখনও শাৎজে ও খিঞ্জেমানে দখল করিয়া রহিয়াছে— এই বলিয়া প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই অভিযোগ করিয়াছেন। ইয়াশের বলিয়া কোন স্থান বা এলাকার কথা ভারত সরকার অবগত নহেন। চীনা সংবাদপত্রগুলিতে হালে ছোট মাপের যেসকল মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অবস্থান বিচার করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে, সিমলা নিয়মপত্রের মানচিত্রের ১৫৭২১ নং উচ্চতার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র এলাকাই ইয়াশের। সীমান্ত এখানে গিয়াছে সোজা উত্তর দিকে এবং যে ভূখণ্ডটি ইয়াশের বলিয়া চিহ্নিত, তাহা ভারতের অভ্যন্তরে। এই এলাকায় ভারতীয় লোকলস্কর যাহাতে সীমান্ত অতিক্রম না করে, সেই জন্য কড়া হুকুম আছে এবং তাহারা সযত্নে ঐ নির্দেশ পালন করিয়াছে। লুং গ্রামটিকে যদি ইয়াশের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভারতীয় সৈনিকেরা যে তাহা কখনও দখল করে নাই, সে-কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

এই এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত হইল থাংলা গিরিশ্রেণী এবং খিঞ্জেমানে উহার দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, চীনা ফৌজ খিঞ্জেমানেতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সেখানে ভারতীয় লোকলস্করকে আতঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। খিঞ্জেমানে এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সিতে খিঞ্জেমানের নিকটবর্তী দ্রক্‌সার গোচারণভূমি বছরের পর বছর ধরিয়া ভারতীয় গ্রাম লাম্‌পোর অধীন। গোচারণ অধিকার বাবদ যা পাওনা, ভারতীয় গ্রাম লাম্‌পোকে সেই পাওনা দিয়া তিব্বতের লে ও তিমাং গ্রামকে এইসকল গোচারণভূমি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে। থাংলা গিরিশ্রেণীর দক্ষিণস্থ অঞ্চলে তিব্বতী কর্তৃপক্ষ কখনও এক্তিয়ার খাটাইয়াছেন বলিয়া কোনো নথিপত্র নাই। শাৎজে সম্পর্কে কথা হইল এই যে, ইহা খিঞ্জেমানের দক্ষিণে এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ কিছুটা অভ্যন্তরে অবস্থিত।

(ঝ) লোংজু ও মিগিতুন

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই বলিয়াছেন, ব্রিটেন ও তিব্বতের মধ্যে যে মন্তব্য-লিপি বিনিময় হইয়াছিল, তাহাতে সংলগ্ন মানচিত্রে প্রচলিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটিকে ভারতীয় ফৌজ

অতিক্রম করিয়াছে এবং কেবল তাহাই নহে, প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রে অঙ্কিত সীমারেখাও তাহারা পার হইয়া গিয়াছে, আবার, অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এই মানচিত্র বহু স্থানে ম্যাকমোহন সীমারেখা অপেক্ষাও বেশি পরিমাণে চীনা ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গিয়াছে। ভারতীয় ফৌজ লোংজুতে "আক্রমণ চালাইয়া দখল করিয়াছিল" এবং মিগিতুনে মোতায়েন চীনা সীমান্তরক্ষীদের উপর তাঁহারা সশস্ত্র আক্রমণ চালাইয়াছিল, ফলে আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা গুলি চালানো ছাড়া চীনা সীমান্তরক্ষীদের গত্যন্তর ছিল না—এই বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

পত্রের পাঠে বলা হইয়াছে, ভারতীয় মানচিত্রগুলিতে ম্যাকমোহন সীমারেখা যেভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত সিমলা নিয়মপত্রের মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমারেখার পরিপূর্ণ মিল আছে। প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রে যেভাবে সীমারেখাটি অঙ্কিত আছে, সেই সীমারেখা ভারতীয় ফৌজ পার হয় নাই। সো কার্‌পো ও সারি সার্‌পা নামে পূত হ্রদ, বারো বছরের তীর্থযাত্রার যাত্রাকেন্দ্র হিসাবে তিব্বতীদের পক্ষে গুরুত্বসম্পন্ন মিগিতুন গ্রাম, মিগিতুন হইতে হ্রদ দুইটি অবধি পথ এবং সারি নিয়িন্‌গ্‌পা নামে পরিচিত অপেক্ষাকৃত ছোট আরও একটি তীর্থযাত্রাপথ তিব্বতের ভিতর ফেলিবার জন্য সিমলা সম্মেলনে অঙ্কিত সীমান্তটি সুবন্‌সিরি এলাকায় জলাশ্রয় হইতে সরাইয়া আনা হয়। এখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত গিয়াছে মিগিতুন গ্রামের ঠিক দক্ষিণ দিয়া। লোংজু মিগিতুন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; উহা সীমান্ত হইতে আরও দেড় মাইল দক্ষিণে। ১৯১৩ সালে বারোখানি কুঁড়েঘর লইয়া মিগিতুন ছিল একটি ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম; অবস্থা আরও খারাপ হইয়া সেখানে ১৯৩৫ সালে ছিল ছয়খানি কুঁড়েঘর ও একটি মঠের সরাইখানা; লোংজু উহার অংশ হইতে পারে না। মিগিতুন গ্রামে সংযুক্ত জমির সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং ঐ জমিগুলি গ্রাম হইতে খুবই অল্প দূর অবধি বিস্তৃত ছিল।

চীনা ফৌজ হালে লোংজুতে অনধিকার-প্রবেশ করিবার পূর্বে তিব্বতী কর্তৃপক্ষ কখনও এই গ্রামে প্রশাসনিক এক্তিয়ার খাটান নাই। ভারতীয় সশস্ত্র পুলিশ দলের উপর নির্দেশ ছিল যে, তাহারা কেবল অনধিকার প্রবেশকারীকে বাধা দিবে এবং কেবল আত্মরক্ষার্থে বলপ্রয়োগ করিবে। চীনারাই অগ্রবর্তী ভারতীয় রক্ষীদের উপর প্রথমে গুলি চালায় এবং পরে বলপূর্বক লোংজু ফাঁড়িটিকে বশীভূত করে। একটি ভারতীয় ফাঁড়ির উপর অধিকতর সংখ্যায় গিয়া সুপরিকল্পিতভাবেই আক্রমণ করিবার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা নাই। তবে, লোংজু সন্দেহাতীতভাবেই ভারতীয় ভূখণ্ড হইলেও, লোংজু এলাকায় ম্যাকমোহন সীমারেখার সঠিক বিন্যাস লইয়া ভারত সরকার চীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। চীন সরকারও লোংজু হইতে ফৌজ অপসারণ করিলে, সেখানে ভারতীয় লোকলস্কর আবার পাঠান হইবে না বলিয়াও ভারত সরকার প্রস্তাব দিয়াছেন। চীন সরকার এখনও পর্যন্ত এই প্রস্তাবের কোনো জবাব দেন নাই।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের পত্র

৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯

পিকিং
৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

মান্যবর, আপনার ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাওয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, ইতিমধ্যে চীনের ভূখণ্ডের মধ্যে কংকা গিরিপথের দক্ষিণস্থ এলাকায় ২১শে অক্টোবর অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে।

এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে চীনা ও ভারতীয় সরকারের মধ্যে কয়েকখানি পত্র বিনিময় হইয়া গিয়াছে—তাহার মধ্যে চীন সরকারের নিকট ভারত সরকারের ৪ঠা নভেম্বরের পত্রও আছে। খুবই দুঃখের কথা এই যে, ভারত সরকারের এই পত্রে দুই দেশের সীমান্তের প্রশ্নে মৌলিক তথ্যাবলী ও সীমান্ত সংঘর্ষ সংক্রান্ত সত্য বহু দিক দিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং কেবল তাহাই নহে, উহাতে যে মনোভাব অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত হানিকর। এরূপ মনোভাব যে সমস্যাটির সমাধানের পক্ষে কোনোক্রমেই সহায়ক নহে, তাহা সুস্পষ্ট।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাইবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা এবং ভবিষ্যতে সীমান্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি করিবার জন্য কাজ করিবার দ্রুত ও বিনা দ্বিধায় কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই, আমার মনে হয়, আমাদের সম্মুখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সর্বপ্রথম কর্তব্য।

চীন-ভারত সীমান্ত কখনও নির্ধারিত হয় নাই; ঐ সীমান্ত খুবই দীর্ঘ এবং দুই দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে খুবই দূরবর্তী অথবা আপেক্ষিক বিচারে দূরবর্তী, তাই আমার আশঙ্কা এই যে, দুই সরকার যদি সম্পূর্ণ উপযোগী কোনো মীমাংসা না ঘটান, তাহা হইলে, উভয়পক্ষের অবাঞ্ছিত সীমান্ত সংঘর্ষ ভবিষ্যতে আবার ঘটিতে পারে।

অধিকন্তু, একবার এমন সংঘর্ষ ঘটিলে, তাহা গৌণ সংঘর্ষ হইলেও, আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন লোকেরা তাহাদের মতলব হাসিল করিবার জন্য উহা ব্যবহার করিবে।

আমাদের দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের ইতিহাস রহিয়াছে, মৌলিক স্বার্থের কোনো সংঘাত তাহাতে নাই এবং আমাদের দুই সরকার হইলেন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীলের উদ্যোক্তা। আমাদের দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা চলিতে দিবার কোনো কারণ আমাদের নাই।

মান্যবর, আপনার ২৬শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে এমন অনেক দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে, যাহার সহিত চীন সরকার একমত হইতে পারেন না। সেই সকল বিষয়ে আমি অন্য এক

সময় বলিতে চাই।

তবে, ঐ পত্রে আবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখিবার উপর ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং চীন সরকার বরাবর এই যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, ইতিমধ্যে যেসকল সীমান্ত-বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণভাবেই মীমাংসা করিতে হইবে, এই মতের সঙ্গে ভারত সরকার একমত এবং মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সময়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে হইবে—কোনো পক্ষ কোনক্রমে তাহা পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিবেন না। ইহাতে আমি আনন্দিত।

দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত স্থিতাবস্থা কার্যকরভাবে বজায় রাখিবার জন্য সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে শান্ত অবস্থা সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং সীমান্তের প্রশ্নের বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য চীন সরকার প্রস্তাব করিতেছেন যে, পূর্বে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা হইতে এবং পশ্চিমে যে রেখা পর্যন্ত এক এক পক্ষ যথার্থ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন সেখান হইতে চীন ও ভারত উভয়ের সশস্ত্র শক্তি এখনই ২০ কিলোমিটার (সাড়ে বারো মাইল) করিয়া সরিয়া যান এবং যে এলাকা উভয়পক্ষ এইভাবে ছাড়িয়া যাইবেন, সেখানে মোতায়েন করিবার জন্য বা টহল দিবার জন্য সশস্ত্র লোকজন পাঠাইতে বিরত থাকা হইবে বলিয়া উভয়পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিন, কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য উভয়পক্ষ সেখানে বেসামরিক প্রশাসনিক লোকজন ও নিরস্ত্র পুলিশ বজায় রাখুন।

লোংজুতে কোনো পক্ষ যেন সশস্ত্র লোকজন না পাঠান বলিয়া ভারত সরকারের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে যে প্রস্তাব রহিয়াছে, কার্যত তাহাই এই প্রস্তাবে চীন ও ভারতের মধ্যে সমগ্র সীমান্তে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দুই পক্ষের ফৌজের মধ্যে ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) ব্যবধান সৃষ্টি করা হউক। এই ব্যবধান বাড়াইবার কোনো প্রয়োজন থাকিলে, চীন সরকার তাহাও বিবেচনা করিতে প্রস্তুত।

এক কথায়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হইবার পূর্বে এবং পরেও, আমাদের দুই দেশ যাহাতে আর কখনও সীমান্তের প্রশ্নে সংঘর্ষে না পড়ে বা তাহার আশঙ্কা না থাকে, সেজন্য দুই দেশের মধ্যে অতীব শান্তিপূর্ণ ও অতীব নিরাপদ সীমান্ত এলাকা সৃষ্টি করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের চেষ্টা করিতে চীন সরকার ইচ্ছুক।

চীন সরকারের এই প্রস্তাব ভারত সরকারের গ্রহণযোগ্য হইলে, ইহা কার্যে পরিণত করিবার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলী দুই সরকার এখনই কূটনৈতিক সূত্রে আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে পারেন।

সীমান্তের পরিস্থিতিতে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার কোনো ইচ্ছা চীন সরকারের কখনও ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, মান্যবর, আপনিও চাহেন যে, বর্তমান উত্তেজনার উপশম ঘটুক। আমাদের দুই দেশের একশত কোটির বেশি মানুষের দীর্ঘকালের মহান বন্ধুত্বের স্বার্থে আমার আন্তরিক আশা এই যে, চীনা ও ভারতীয় সরকার যুক্ত প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে দ্রুত মতৈক্যে পৌঁছিবেন।

চীন সরকার প্রস্তাব করিতেছেন যে, সীমান্তের প্রশ্ন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া আরও আলোচনার জন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আশু ভবিষ্যতে আলোচনায় বসুন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমাদের দুই দেশের মানুষ চাহেন যে, আমরা দ্রুত সক্রিয় হই। আমি মনে করি, তাঁহাদের সেই কামনা অনুসারেই আমাদের কাজ করা উচিত এবং চীন ও ভারতের মধ্যে মহান বন্ধুত্ব নষ্ট করিতে যাহারা প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাদের জঘন্য স্বার্থ যাহাতে সাধিত না হইতে পারে, সেজন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে।

মান্যবর, আপনি শীঘ্রই পত্রের জবাব দিবেন বলিয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি।

এই সুযোগে আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

(স্বাঃ) চৌ এন-লাই

চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী

চীনের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত শ্রীনেহরুর পত্র

১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯

নূতন দিল্লী
১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ৭ই নভেম্বরের পত্র আমি পাইয়াছি। এই পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীপার্থসারথির সহিত ঐ দিনই আপনার যে আলোচনা হইয়াছে সে-সম্পর্কিত বিবরণও আমি পাইয়াছি।

দিল্লীতে ৪ঠা নভেম্বর তারিখে আপনার রাষ্ট্রদূতের হাতে যে নোট আমরা দিয়াছি তাহাতে লাদাকে আন্তর্জাতিক লাইন ও তাহার সমর্থনে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। আর উহারই সঙ্গে ২১শে অক্টোবর তারিখে চাং চেনমো উপত্যকায় অনুষ্ঠিত যে ঘটনার ফলে অনেক ভারতীয় লোকলস্করের মৃত্যু অথবা গ্রেপ্তার ঘটে, সে ঘটনার বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও দেওয়া হইয়াছে।

ইতিপূর্বে, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাকে যে চিঠি আমি দিই, তাহাতে সমগ্র চীন-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের বিবৃতির সমর্থনে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হইয়াছে। আমি এখনও আমার ২৬শে সেপ্টেম্বরের চিঠির জবাব পাই নাই। পরবর্তী ৪ঠা নভেম্বরের নোটেরও কোনো বিশদ জবাব পাই নাই।

দুঃখের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, এই দুইটি পত্রে আমরা যেসব তথ্য দিয়াছি তাহা আপনি বিবেচনা করেন নাই এবং এই বলিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিয়াছেন যে, আমাদের এই নোটে "সীমান্ত সংঘর্ষ সংক্রান্ত সত্য ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করা হইয়াছে"। এই মন্তব্য মানিয়া লইতে আমি একেবারেই রাজি নহি। আমাদের উভয় দেশের মধ্যে বর্তমান উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য সকল উপায় উদ্ভাবন নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু তথ্য অস্বীকার করিলে আমাদের প্রয়াস সফল হইবে না।

পূর্বের এক পত্রে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি বলিতে চাই যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত উক্ত সীমান্ত শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সেখানে কোনও সংঘর্ষ বা গোলযোগ হয় নাই। সাম্প্রতিককালেই মাত্র সীমান্ত লইয়া সংঘর্ষ ও অসুবিধা দেখা দিয়াছে। আমাদের কোনও ব্যবস্থার দরুন এই সকল অসুবিধা দেখা দেয় নাই। সীমান্তে আপনাদের দিক হইতে অবলম্বিত ব্যবস্থাই সাম্প্রতিক গোলযোগের হেতু।

এই সীমান্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট বোঝাবুঝি যে হওয়া উচিত এবং সীমান্ত-বিরোধ যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হয় সেজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। আমি মনে করি, আশু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল, বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার উপযোগী আবহাওয়া যাহাতে হয় সেজন্য সমস্ত সীমান্ত-বিরোধ এড়ানোর ব্যবস্থা করা। কাজেই আমরা স্বীকার করি যে, দেরি না করিয়া দুই সরকার একটি ব্যবস্থা করুন যাহা সীমান্ত সংঘর্ষের ঝুঁকি দূর করিতে পারে।

এই বিষয়ে আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা ভারত গভর্নমেন্ট গভীরভাবে ও সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে-বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আপনাকে ইহা জানান দরকার যে, চাং চেনমো উপত্যকায় গত ২০শে ও ২১শে অক্টোবর তারিখে আমাদের পুলিশ টহলদার দলের উপর আঘাত হানিবার পর আপনার সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় সীমান্তে পুলিশ বাহিনীর যাঁহারা ধৃত হন তাঁহাদিগকে ছাড়িবার ব্যাপারে যেভাবে বিলম্ব করা হইয়াছে সেজন্য ভারতের জনগণের বিরক্তি উদ্রেক হইয়াছে। আপনি মনে করিয়া দেখুন যে, ২৪শে অক্টোবর তারিখে ভারত জানিতে পারে যে, আপনারা ধৃত ব্যক্তিদিগকে এবং নিহতদের দেহগুলিকে ফিরাইয়া দিতে চান। ২৬শে অক্টোবর পিকিংস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত চীন সরকারকে ধৃতদিগকে এবং শবদেহগুলিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ভারতের ব্যগ্রতার কথা জ্ঞাপন করেন। হস্তান্তরের স্থান ও কাল আমরা জানিতে চাই। যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহার জন্য বন্দীদিগকে ও শবদেহগুলিকে পাইবার জন্য ভারত হইতে একটি বাহিনীকে তখনই পাঠানও হয়। ঘটনাস্থল হইতে পাঁচ মাইল দূরে উক্ত দল অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু আপনার গভর্নমেন্টকে বারবার মনে করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, ১২ই নভেম্বরের পূর্বে আপনার সরকার স্থান-কাল জানান না। ১৪ই নভেম্বর তারিখে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর হাতে বন্দীদিগকে এবং শবদেহগুলিকে দেওয়া হইয়াছে জানিয়া আমরা এখন আশ্বস্ত হইয়াছি।

পিকিংস্থ আমাদের রাষ্ট্রদূতের সহিত কথাবার্তার সময় তাঁহাকে আপনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ৪ঠা নভেম্বরের নোটে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া যাহা প্রেরণ করা হয়, ধৃত বন্দীদের আপনাদের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি তাহা খণ্ডন করিয়াছে। তাহার পর এই প্রশ্নে ১৪ই নভেম্বর তারিখে চীনের উপমন্ত্রী আমাদের রাষ্ট্রদূতের কাছে যে নোট দিয়াছেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আমরা এখনও মুক্ত বন্দীদের নিকট হইতে ২০শে ও ২১শে তারিখের ঘটনাবলী সম্পর্কে অথবা কি অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারা গ্রেপ্তারকারীদের নিকট বিবৃতি দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও রিপোর্ট পাই নাই। আপনার পত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহাদিগকে বারবার জেরার সম্মুখীন করা হয়। বন্দীদিগকে এভাবে জেরা করা নিন্দনীয়।

বর্তমানে ভারত ও চীনের সশস্ত্র ফৌজ যে লাইনে অবস্থান করিতেছে উহা হইতে উভয় দিকে কুড়ি কিলোমিটার (প্রায় সাড়ে বারো মাইল) সরিয়া যাইবার প্রস্তাব আপনার পত্রে করিয়াছেন। আপনার মতে ইহা দ্বারা সীমান্ত সংঘর্ষ কার্যকরভাবে বাধা দেওয়া যাইবে। উক্ত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বেই আমি স্পষ্টভাবে জানাইতে চাই যে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের উপরে অথবা নিকটে কোনো স্থানে কোনো সৈন্যসামন্ত ভারত সরকার রাখে নাই। আমাদের চেকপোস্টগুলিতে হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত অসামরিক কনস্টেবলগণ থাকিতেন। এই চেকপোস্টগুলির আসল উদ্দেশ্য হইল স্বীকৃত রাস্তাগুলি দিয়া যে ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা যাতায়াত করে তাহাদের দেখা, যাহাতে কোনো অবাঞ্ছিত ও আপত্তিকর লোক সীমান্ত লঙ্ঘন করিতে না পারে তাহা লক্ষ্য রাখা। এই ঘটনাই প্রকট করে যে, কোনও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বা সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্দেশ্য ঐগুলির ছিল না। সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলীর পরেই সামরিক বাহিনীকে সমগ্র সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমরা বলিয়াছি।

সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াইবার উপযোগী কোনও প্রস্তাব বিবেচনা করিতে হইলে সমগ্র ভারত-চীন সীমান্তের তথ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। সত্য ঘটনা হইতেছে এই যে, আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে (ম্যাকমোহন লাইন বলিয়া কথিত) সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল সুদীর্ঘ বৎসর ধরিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অসামরিক কর্তৃপক্ষ সেখানে শাসন করিয়া আসিতেছেন। আর সীমান্ত হইতে বড় বেশি দূরে নয় এমন স্থানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক বিভাগীয় দপ্তরও রহিয়াছে। লোংজু ছাড়া সেখানে আর কোনো স্থানই চীনা সৈন্যের দখলে নাই। এখানে সীমান্ত এমন স্থানে অবস্থিত যাহার উচ্চতা চৌদ্দ হাজার হইতে কুড়ি হাজার ফিট পর্যন্ত। এই অসুবিধাজনক অঞ্চলে আমাদের সমস্ত চেকপোস্টই পাহাড়ের উচ্চ স্থানে অবস্থিত। চীনের চেকপোস্টগুলি কোথায় আছে তাহা আমরা জানি না। তবে জানিতে পারিয়াছি যে, সমগ্র সীমান্তের উভয় দিককার কোনও চেকপোস্ট হইতেই অপর দিকের চেকপোস্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। অসুবিধাজনক পাহাড়ী অঞ্চলে যদি কোনও স্থানের দূরত্ব মানচিত্রে অথবা সোজাপথে কমও হয় সেখানেও এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে হইলে কয়েক দিন লাগিয়া যাইতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় বিচার করিলে আমরা মনে করি যে, উভয় সরকারই যদি তাঁহাদের ফাঁড়িগুলিকে টহল দিবার জন্য লোক না পাঠাইবার নির্দেশ দেন তাহা হইলে সীমান্ত সংঘর্ষের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি থাকিবে না। কেবলমাত্র যখন এই সমস্ত দুর্গম স্থানগুলিতে সশস্ত্র টহলদারী দল গিয়া পড়ে, তখনই সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, আমরা বর্তমানে কোনো টহলদার দলকে অগ্রসর হইতে না পাঠানোর জন্য সীমান্তের ফাঁড়িগুলিকে নির্দেশ দিয়াছি। আন্তর্জাতিক সীমানা হইতে ১০ বা ২০ কিলোমিটার যাহাই হউক না কেন, পিছু হটিয়া নূতন ফাঁড়ি স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন। আপনার সরকার যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে সীমান্ত সংঘর্ষের বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে।

লোংজুর অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা আগেই বারবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, লোংজু যে তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইনের আপনাদের অংশের দিকে—আপনাদের এই কথা আমরা মানি না। উহা যে আমাদের সীমানার মধ্যে এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই। তবে লোংজু আপনাদেরই হউক আর আমাদেরই হউক, আসল কথা হইল এই যে, আপনাদের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের লোকজনের উপর আক্রমণ চালাইয়া লোংজু হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহাদের হতাহত করিয়া বলপূর্বক আমাদের ফাঁড়ি দখল করিয়াছিল। কাজেই যে ব্যবস্থায় লোংজুতে আপনাদের জবরদখল বজায় থাকিবে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন হইলেও আমরা তাহাতে রাজী হইতে পারি না। সঠিক পন্থা হইল, আপনাদের লোংজু হইতে সরিয়া যাওয়া উচিত এবং আমাদের দিক হইতেও আমরা উহা পুনর্দখল করিব না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে এখনই উত্তেজনা প্রশমন হইবে।

এই সীমান্তের কোথাও বা অন্য কোথাও আমরা আপনাদের কোনো ঘাঁটি দখল করি নাই। আমাদের রাষ্ট্রদূতের সহিত আলাপকালে আপনারা বলিয়াছেন যে, 'খিঞ্জেমানে' আন্তর্জাতিক সীমানার উত্তরে অবস্থিত। আমি এই বিবৃতি মানিয়া লইতে পারি না। খিঞ্জেমানে পরিষ্কারভাবেই ঐ আন্তর্জাতিক সীমানার দক্ষিণে এবং বরাবরই আমাদের দখলে আছে।

আপনারা সৈন্য অপসারণের এলাকা সম্পর্কে যে প্রস্তাব দিয়াছেন, আমার মনে হয় যে, উহা উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সীমানাগুলি যেখানে চীনের সীমানার পাশাপাশি সেই সব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের এই সকল সীমানা বিষয়ের কোনো অস্পষ্টতা নাই এবং চীনা কর্তৃপক্ষ ঐ সীমানার দক্ষিণে কোনো অঞ্চল দখল করেন নাই। ইহা সিকিমের সীমানা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য আমি পূর্বেই যে প্রস্তাব দিয়াছি সীমান্তের এই ক্ষেত্রেও সেই প্রস্তাব মানিলে সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না।

এখন আমি আমাদের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের লাদাক অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর আপনার নিকট লিখিত আমার পত্রে ও ৪ঠা নভেম্বর নোটে ঐ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমারেখা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সমর্থনে সত্য ঘটনারও উল্লেখ করা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা এখনও সঠিকভাবে জানি না যে, চীন সরকার যে-সকল দাবি করিতেছেন তদনুযায়ী সীমান্তরেখা প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থিত। চীন কর্তৃক প্রকাশিত ছোট ছোট মানচিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া উহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই মানচিত্রগুলি সব একরকম নহে এবং এগুলিতে কখনও কখনও আলাদা আলাদা লাইন দেখান হইয়াছে।

আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, চীনের মানচিত্রে সীমান্তরেখা পর্যন্ত যে অঞ্চল চীনের অধিকারে আছে বলিয়া বলা হইতেছে তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ভারত সরকারই ঐ অঞ্চলে কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেছেন। অবশ্য এই এলাকা জনহীন, কাজেই যে-সকল অঞ্চলে লোক আছে সেই সকল অঞ্চলের পরিচালনার ব্যবস্থার সহিত এই অঞ্চল অধিকারে রাখার প্রকৃতি অনিবার্যভাবেই স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলটি হইতেছে সমুদ্র-স্তর হইতে ১৪,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং বসতিহীন পার্বত্য অঞ্চল। এখানের পর্বতশিখরগুলির উচ্চতা আরো বেশি।

এইসব কারণে এবং যেহেতু আমাদের সীমান্তে কোনোপ্রকার আক্রমণ আমরা প্রত্যাশা করি নাই, সেইহেতু আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর চেকপোস্ট বসাইবার প্রয়োজন আমরা চিন্তা করি নাই। কিন্তু আমার ২৬শে সেপ্টেম্বরের পত্রে এবং ৪ঠা নভেম্বরের নোটে যাহা লেখা হইয়াছিল, সেইমতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত নিয়মিত টহলদারী দল পাঠানোর দ্বারাই এই অঞ্চলে আমাদের এক্তিয়ার প্রয়োগ আমরা করিয়াছিলাম। বাণিজ্যের রাস্তা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সীমান্ত হইতে কিছু দূরে কতকগুলি পুলিশ চেকপোস্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেহেতু এই বিবৃতিকে আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, সেইহেতু ইহা পরিষ্কার যে, দখল নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কেও দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে পরিপূর্ণ মতানৈক্য রহিয়াছে। সুতরাং, স্থিতাবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সম্বন্ধেই যখন মতবিরোধ, তখন স্থিতাবস্থা সংক্রান্ত যে কোনো চুক্তিই অর্থহীন হইয়া পড়ে। আমরা এখন সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াইবার স্বল্পমেয়াদী অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার কথা যখন আলোচনা করিতেছি, তখন আলোচনার এই স্তরে স্থিতাবস্থা লইয়া অন্তহীন আলোচনায় আমাদের রত না হওয়াই কর্তব্য।

অতএব, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, লাদাক এলাকা সম্বন্ধে আমাদের উভয় গভর্নমেন্টের নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় রাজী হওয়া উচিত। চীন সরকারের ১৯৫৬ সালের মানচিত্রে যে আন্তর্জাতিক সীমানা দেখানো হইয়াছে, ভারত সরকার সেই সীমানার পশ্চিমে তাহার সমস্ত লোকজন অপসারণ করুন। আমরা যতদুর জানি, এই মানচিত্রই হইতেছে তাহাদের সর্বসাম্প্রতিক মানচিত্র। অনুরূপভাবে, ভারত সরকারের পূর্বকার নোটে এবং চিঠিপত্রে যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা ভারত সরকারের সরকারি মানচিত্রে দেখানো হইয়াছে, চীন সরকার তাহার লোকজনকে সেই সীমানার পূর্বদিকে সরাইয়া লউন। যেহেতু দুই সীমারেখার মধ্যে বিপুল দূরত্ব রহিয়াছে সেইহেতু এই অঞ্চলে দুই পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের বিন্দুমাত্র কোনো ঝুঁকি থাকিবে না। পূর্বে এবং পশ্চিমে দুই সীমারেখার মধ্যকার এই অঞ্চলে প্রায় কোনো লোকের বসবাস না থাকায় শাসন বিভাগেরও কোনো লোকজন রাখার প্রয়োজন নাই।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি উভয় দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি উপলব্ধি করিতেছি। গত দশ বৎসর যাবৎ আমি ইহারই জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কেবলমাত্র বন্ধুত্বের কথা বলিয়াই যে-বিচ্ছেদ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করা যাইবে না। আমাদিগকে পরিস্থিতির বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং বর্তমান পরিস্থিতি এইরূপ যে, যদি চীন সরকার ও ভারত সরকার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ইহা যাহাতে না হয় তজ্জন্য আমি উদ্‌গ্রীব; কারণ এই ধরনের পরিণতি ঘটিলে তাহা শুধু আমাদের এই দুই দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করিবে তাহাই নহে, সাধারণভাবে বিশ্ব-শান্তিরও ক্ষতি করিবে।

দুই দেশের মধ্যকার সীমান্ত-প্রশ্নগুলি ও অন্যান্য অমীমাংসিত বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য মান্যবর, আপনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, আশু ভবিষ্যতে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কথাবার্তা বলুন। আপনার প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, আপনার সহিত দেখা করিতে ও আমাদের দুই দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত মত-বিরোধগুলি আলোচনা করিতে ও বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার পথ বাহির করিতে সর্বদাই আমি প্রস্তুত। আমাদের উভয়পক্ষেরই কামনা হইল যে, এই বৈঠক যেন ফলপ্রসূ হয়। কাজেই আমাদের বৈঠকের আলোচনার প্রকৃতি এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে তথ্যের অরণ্যের মধ্যে যেন আমরা হারাইয়া না যাই। আমাদের পত্রালাপ হইতে ইহা দেখা গিয়াছে যে বিষয়টির সহিত প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য, মানচিত্র ইত্যাদি জড়িত। তাই প্রাথমিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও আমাদের আলোচনার ভিত্তি রচিত হওয়া দরকার। ইহা যদি না করা হয়, তবে এই সাক্ষাৎকারের যে সুফলের জন্য আমাদের এত বেশি আগ্রহ, সেই সুফল না হইবার আশঙ্কা আছে। তাহাতে আমাদের দুই দেশের কোটি কোটি লোক হতাশ হইয়া পড়িবে।

সুতরাং, উপযুক্ত সময়ে এবং স্থানে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত; তবে আমি অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন বোঝাপড়ার উপরই এখন

আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। তাহাতে বর্তমান মনকষাকষি দূর করিতে সাহায্য হইবে এবং অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইবে না। তাহার পর প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং মান্যবর, আপনার ও আমার পক্ষে সুবিধাজনকভাবে সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করা যাইতে পারে।

ভারত ও চীনের মৈত্রীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার যে একান্ত আগ্রহ আমার ও আমার দেশবাসীর আছে তাহার সম্বন্ধে আপনাকে সুনিশ্চিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আপনার অকৃত্রিম
(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু

শ্রীনেহরুর ১৬ই নভেম্বরের পত্রের জবাবে চৌ এন-লাইয়ের পত্র

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯

পিকিং
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯

মহামান্য শ্রীজওহরলাল নেহরু
প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র, নয়াদিল্লী

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। যদিও চীন সরকারের ৭ই নভেম্বরের প্রস্তাবের সহিত সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াইবার ব্যাপারে ভারত সরকারের অভিমতের এখনও কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে এবং উহার একাংশে স্পষ্টতই ন্যায় বিচারের অভাব রহিয়াছে, তথাপি ইহা আনন্দের বিষয় যে, আপনার পত্রে আপনি সমস্ত সীমান্ত সংঘর্ষ এড়াইবার এবং দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত-বিরোধগুলি মিটাইবার চেষ্টার অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন।

সমস্ত সীমান্ত জুড়িয়া দুইপক্ষেরই সশস্ত্র সৈন্য যথাক্রমে বিশ কিলোমিটার করিয়া সরাইয়া লইবার যে-প্রস্তাব গত ৭ই নভেম্বর চীন সরকার দিয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল, পূর্ব হইতে পুরোপুরি আঁচ করা যায় না এমন সব সীমান্ত সংঘর্ষের বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করা, যেখানে দুই দেশ সশস্ত্র অবস্থায় পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থিত সেই সীমান্তের বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা। অন্যান্য অস্থায়ী ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নহে।

তাহা ছাড়া, যতদিন সীমান্ত নির্ধারিত না হইতেছে ততদিনের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে, উহা সীমান্ত প্রশ্নের মীমাংসা আলোচনাকালে কোনক্রমে কোনো পক্ষেরই নিজ দাবি উপস্থিত করার অন্তরায় হইবে না। অতএব, চীন সরকার এখনও আন্তরিকভাবে আশা করেন যে, অতীতে এবং ভবিষ্যতের শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদের দুই দেশের মৈত্রীর স্বার্থেই আমরা যেন মতৈক্যে পৌঁছিতে পারি। প্রত্যেক দেশের সশস্ত্র সৈন্য কতদূর সরিয়া যাইবে, সে সম্পর্কে বলিতে চাই যে, ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশ কর্তৃক যথাযথ বলিয়া বিবেচিত দূরত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চীন সরকার সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।

উল্লিখিত মতৈক্য যতদিন না হইতেছে, ততদিনের জন্য আপনি আপনার পত্রে লোংজুতে কোনো পক্ষেরই সশস্ত্র সৈন্য না রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সীমান্তে অন্যান্য বিরোধের স্থানগুলি সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়া প্রথমে একটি আংশিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য চীন সরকার আপস-মীমাংসার মনোভাব লইয়া এবং সমগ্র সীমান্তে

সশস্ত্র সৈন্য অপসারণের দিকে আগাইয়া যাইবারই অভিপ্রায়ে সম্মত আছেন। চীন-ভারত সীমান্তের পূর্ব অংশে সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর এক সময় লোংজু দখল করিয়াছিল এবং এখনও খিঞ্জেমানে দখল করিয়া আছে।

চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিম অংশে সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর এখনও পর্যন্ত শিপকি গিরিপথ, পারিয়গল, সাং, জুংশা, পুলিংসুমদো, চুতা, চুজে, সাচে, লাপথাল দখল করিয়া আছে। এই স্থানগুলি নিশ্চিতভাবে চীনে এবং ১৯৫৪ সালে ভারতে ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াতের সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর প্রায় সবগুলি স্থান দখল করিয়াছে। ১৯৫৪ সালের এই চুক্তিতে ভারত ও চীন সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল উপস্থিত করিয়াছিল। যে দশটি স্থানে ১৯৫৪ সালের চুক্তির দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় চীনের তিব্বত অঞ্চলের আরি এলাকায় ব্যবসায়ের জন্য রাস্তা খুলিতে চীন সরকার সম্মত হইয়াছিলেন তাহারই একটি হইল পুলিং-সুমদো। এখন যেহেতু ভারত সরকার এই স্থানগুলির মালিকানা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন সেইহেতু চীন সরকার প্রস্তাব করিতেছেন যে, ঐ স্থানগুলির কোনোস্থানেই কোনো পক্ষেরই সশস্ত্র লোকলস্কর থাকিবে না।

দুই পক্ষের মধ্যে আরও মতৈক্য না হওয়া পর্যন্ত, সীমান্তের চৌকিগুলি হইতে দুই পক্ষেরই টহলদারী সৈন্য প্রেরণ বন্ধের জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবটিকেও চীন সরকার স্বাগত জানাইতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, কংকা গিরিপথের ঘটনার পর চীন সরকার চীনা সীমান্তরক্ষীদের চীন-ভারত সীমান্তস্থিত তাহাদের সমস্ত চৌকি হইতে টহলদার পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন। এখন ভারতের পক্ষ হইতেও যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্তের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আনন্দের ও অগ্রগতির বিষয়।

কিন্তু চীন সরকার একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিতে চাহেন, তাহা হইল : টহল বন্ধের প্রস্তাব সমগ্র চীন-ভারত সীমান্তে প্রযোজ্য হইবে, চীন ও ভারতের লাদাকের মধ্যবর্তী সীমান্তের অংশে কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না।

আপনি চীন ও ভারতের লাদাকের মধ্যবর্তী সীমান্ত অংশে সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে চীন সরকার খুবই ধাঁধায় পড়িয়াছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দেখাইয়া দেওয়া চীন সরকার প্রয়োজন মনে করিতেছেন :

(১) সীমান্তের এই অংশকে একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট বিষয় বলিয়া বিবেচনা করার কোনো কারণ নাই। এই অংশে কোন্ রেখা পর্যন্ত কাহার নিয়ন্ত্রণ চালু রহিয়াছে তাহা খুবই স্পষ্ট, যেমন স্পষ্ট চীন-ভারত সীমান্তের অন্যান্য অংশে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত যে চীনা মানচিত্রের কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশে দুই দেশের মধ্যকার চিরাচরিত সীমান্ত সঠিকভাবেই দেখানো হইয়াছে।

সাংগাতমাংপু নদীতীরবর্তী পারিগাস এলাকা ছাড়া, চিরাচরিত সীমান্তের এই অংশের পূর্বদিকের কোনো চীনা অঞ্চল ভারত দখল করে নাই।

(২) সীমান্তে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থা রহিয়াছে সেই অবস্থাকে আপাতত বহাল

রাখিবার যে নীতি পূর্বে দুই দেশ মানিয়া লইয়াছিল, আপনার এই প্রস্তাবে তাহা হইতে অনেক দূর পিছু হটিয়া যাওয়া হইয়াছে। সীমান্ত-সংঘর্ষ বিলুপ্ত করার পূর্বশর্ত হিসাবে সেই অবস্থার একটা বড় রকমের পরিবর্তন দাবি করার অর্থ বিরোধকে কমানো নয়, বাড়াইয়া তোলা।

(৩) মান্যবর, আপনার প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত নহে। আপনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই অংশে চীনা লোকলস্কর ভারতীয় মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমান্তের পূর্বদিকে সরিয়া যাইবে এবং ভারতীয় লোকলস্কর চীনা মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমান্তের পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবে। যাহারা আসল ঘটনা জানে না তাহাদের নিকট প্রস্তাবটি "বৈষম্যহীন" বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যাহারা ঘোর চীন-বিরোধী তাঁহারা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতের 'কনসেশন' হইবে শুধুমাত্র তত্ত্বগত, কারণ, প্রথমত সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ভারতের নহে এবং সরাইয়া আনার মত কোনো লোকলস্কর সেখানে ভারতের নাই; কিন্তু চীনকে প্রায় ৩৩,০০০ বর্গ-কিলোমিটার আয়তনের এমন এক অঞ্চল হইতে সরিয়া আসিতে হইবে যে-অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরিয়া চীনেরই। এই অঞ্চলের সীমান্তে চীনের সামরিক লোকলস্কর পাহারা দিতেছে এবং এখানে চীনের বেসামরিক শাসন রহিয়াছে; স্বায়ত্তশাসিত তিব্বত অঞ্চলের যথাক্রমে হোতিয়ান ফাউন্টি সাকিয়াং-উইগুর স্বায়ত্তশাসিত এলাকা এবং আরি এলাকার রুজকজং-এর লোকজন এই বেসামরিক প্রশাসনিক কার্য চালাইতেছে।

(৪) এই এলাকাটি বহুকাল হইল চীনের এক্তিয়ারে রহিয়াছে; চীনের পক্ষে এলাকাটি খুবই গুরুত্বসম্পন্ন। চিং বংশের আমল হইতেই এই এলাকাটি যানবাহনের পথ; সিন্‌কিয়াং ও পশ্চিম তিব্বত এলাকার বিরাট অঞ্চলের জন্য ইহা যোগসূত্র। আজ নয়, ১৯৫০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই এলাকার চিরাচরিত পথ বাহিয়াই চীন জনগণের মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলি সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য সিন্‌কিয়াং হইতে তিব্বতের আরি এলাকায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর নয় বৎসর ধরিয়া তাহারা সরবরাহের প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে এই পথ কাজে লাগাইতেছে।

এই পথ বরাবরই দক্ষিণ-পশ্চিম সিন্‌কিয়াং-এ ইয়েচিং হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে গারটক পর্যন্ত ১,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মোটর রাস্তা চীনের সীমান্ত রক্ষীরা ৩ সহস্রাধিক বেসামরিক নির্মাণকর্মীর সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ে অত্যন্ত কঠোর প্রাকৃতিক অবস্থায় কাজ করিয়া নির্মাণ করেন; এই মোটর রাস্তাটিকে তাহারা উচ্চ পর্বতমালা ভেদ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, রাস্তায় সেতু ও কালভার্ট তৈরি করা হইয়াছে।

সিন্‌কিয়াং ও তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তি সাধনের পর ৮-৯ বছর যাবৎ গণমুক্তি ফৌজের ইউনিটগুলি এই অঞ্চলে মোতায়েন থাকিয়া টহলরত থাকিবার পর ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই অঞ্চলে সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যরা অনধিকার প্রবেশ করে; এই সমগ্র সময়ে চীনা পক্ষ আপন এক্তিয়ারভুক্ত এই অঞ্চলে কত সব কার্যকলাপ চালাইয়াছেন অথচ তাহা ভারতীয় পক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। এই ঘটনা হইতে একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই অঞ্চলটি বাস্তবিকই বরাবর চীনা কর্তৃত্বের অধীনে রহিয়াছে—

এখানে ভারতীয় কর্তৃত্ব কখনো ছিল না। এখন ভারত সরকার দাবি করিতেছেন যে, এই অঞ্চল সর্বদাই তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এ কথা আদৌ প্রত্যয়জনক নহে।

চীন সরকারের উপরোক্ত বক্তব্য জানিবার পর এখনও যদি ভারত সরকার দাবি করিতে থাকেন যে, এই অঞ্চল সম্পর্কে তাঁহাদের দাবিই ন্যায়সঙ্গত, তাহা হইলে চীন সরকার জানিতে চান—ভারত সরকার সীমান্তের পূর্ব অংশে একই নীতি সমানভাবে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত কিনা; অর্থাৎ তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইন এবং চীনা মানচিত্রে (দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় মানচিত্রেও) প্রদর্শিত চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে চীনা ও ভারতীয় উভয়পক্ষেরই সমস্ত লোকলস্কর অপসারণে তাঁহারা প্রস্তুত কিনা।

চীন সরকার আজ পর্যন্ত তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার দক্ষিণবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে কোনো দাবিই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বা পূর্ব-শর্ত হিসাবে উত্থাপন করেন নাই, কাজেই ভারত সরকার চীনা পক্ষকে উহার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে একতরফাভাবে অপসৃত হইবার দাবি কেন করিবেন, তাহা চীন সরকার বুঝিতে পারেন না।

ভারতীয় পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত চীন-ভারত সীমান্ত বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের কথা মান্যবর আপনি এবং ভারত সরকার বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভবদীয় ২৬শে সেপ্টেম্বরের পত্র এবং ৪ঠা নভেম্বর তারিখের ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী-দপ্তরের লিপি সম্পর্কে বিস্তারিত জবাব চীনা পক্ষ দুই দেশের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের বৈঠকে পেশ করা মনস্থ করিয়াছিলেন; চীনা পক্ষ মনে করিয়াছিলেন, ঐরূপ করাই সঙ্গত হইবে। কিন্তু দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক এখনো হইল না, কাজেই চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দপ্তরই নিকট ভবিষ্যতে উহার জবাব দিবেন।

আমি এক্ষণে বিষয়টির বিস্তারিত পর্যালোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু আর একবার এই সরল কথাটি উল্লেখ করিতে চাই যে, বাস্তব ইতিহাস অনুসারেই আমাদের দুই দেশের মধ্যে সমগ্র সীমান্ত কখনো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করা হয় নাই, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি, দুই দেশের সীমান্ত বিষয়ে ভারতীয় পক্ষ তাঁহাদের বক্তব্যে ইচ্ছা করিয়াই বহু সুস্পষ্ট মৌলিক তথ্য বাদ দিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতীয় পক্ষ এই ঘটনা উল্লেখ করেন নাই যে, অতীতে ১৯৩৮ সালের সংস্করণে অবধি সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সংকলিত সরকারি মানচিত্রগুলিতে চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাঞ্চলের সীমারেখা চীনা মানচিত্রে নির্দেশিত সীমারেখার সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ, আর চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাঞ্চলের কোনো সীমারেখা আদৌ অঙ্কিত হয় নাই; এমন কি চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর প্রকাশিত সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার মানচিত্র ভুলভাবে অঙ্কিত হইলেও উহার ১৯৫০, ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালের সংস্করণে পর্যন্ত চীন-ভারত সীমান্তের পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর অঞ্চলে সীমারেখা অনির্ধারিত বলিয়াই স্পষ্ট দেখানো হইয়াছে। সম্প্রতিকালে ভারত সরকার কোন্ যুক্তিবলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই অনির্ধারিত সীমান্তকে আপন মানচিত্রে নির্ধারিত সীমান্ত করিয়া সহসা বদল করিতে লাগিলেন, তাহা চীন সরকারের নিকট বোধগম্য নয়। আপনার ২৬শে সেপ্টেম্বর

তারিখের পত্রে যে বিপুল তথ্যের উল্লেখ আছে, তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু তথাপি কোনো সন্তোষজনক জবাব পাই নাই।

চীন সরকার বহুবার জানাইয়াছেন যে, চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চল অতি দীর্ঘ, দুই দেশের সরকার এই সীমারেখা কখনো নির্দিষ্ট করেন নাই, দুই দেশের মানচিত্রের মধ্যে তারতম্য আছে, কাজেই সীমানা সম্পর্কে দুই দেশ যে পৃথক মত পোষণ করিবে তাহা স্বাভাবিক। বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-পরামর্শের মারফত যদি চেষ্টা করা হয় তবে এই অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বিষয়টির ন্যায়সঙ্গত সমাধান সাধন করা আদৌ কঠিন হইবে না।

চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র শ্রমজীবী জনগণের একটি সমাজবাদী দেশ, বহির্মুখী সম্প্রসারণ দ্বারা এবং অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দ্বারা যে শোষক-শ্রেণীগুলি ও সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থক শক্তিগুলি আপন লিপ্সা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিত, তাহাদের অস্তিত্ব চীনদেশের বহুকাল হইল চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীলের প্রতি সদা অনুগত; অন্যান্য দেশ সম্পর্কে বৃহতের প্রাধান্যমূলক উগ্র জাতীয়তার মনোভাবে চীন আমলই দিতে পারে না, পরদেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ অঞ্চলে তাহার অনধিকার প্রবেশ তো দূরের কথা।

অধিকন্তু, চীনের নিজের ভূমিই কত বিশাল বিস্তৃত, ইহার অর্ধেকের বেশীর ভাগই বিরল-বসতি অঞ্চল, এই সকল অঞ্চলের উন্নয়নে প্রভূত চেষ্টার প্রয়োজন হইবে। তথাপি এই রকম একটা দেশ প্রতিবেশী একটি দেশের কোনো কোনো জনবিরল অঞ্চলে গিয়া গোলমাল সৃষ্টি করিতে চাহিবে—এমন কথা চিন্তা করাও অতি হাস্যকর। সুতরাং, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উহার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যবর্তী (এই দেশগুলি ছোট হউক, বড় হউক, চীনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হউক বা না হউক) সীমান্তের কোনো কোনো অঞ্চলে সীমারেখা অনির্ধারিত থাকিলেও, চীন একতরফা কার্যাবলীর দ্বারা সীমান্তের অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধনের জন্য কোনোদিন উপরোক্ত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে নাই এবং কখনো করিবে না।

অধিকন্তু, অমীমাংসিত সীমান্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবার পরেও সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত মিলিতভাবে এবং সহযোগিতায় সর্বোচ্চতম শান্তিপূর্ণ নিরাপদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সীমান্ত সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে চীন প্রস্তুত। মান্যবর প্রধানমন্ত্রী, আপনি জানেন, চীন-ভারত সীমান্তের পূর্ব অঞ্চলে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটি অতীতেও কখনো কোনো চীনা সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে নাই, চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের সরকারও উহাকে স্বীকার করেন নাই, তথাপি সীমান্ত প্রশ্নের বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসা সাপেক্ষে চীনা সশস্ত্র রক্ষীদলকে এই সীমারেখা কিছুতেই অতিক্রম করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা জারি করা হইয়াছিল, চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের সরকার তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন।

চীন তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার দক্ষিণবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কখনো কোনো পদক্ষেপ পর্যন্ত করে নাই, যদিও অনতিদূরে অতীতে এই অঞ্চল ছিল চীনের তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের শাসনাধীন (১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের অংশে), কাজেই চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিম এলাকার কোনো স্থানে ভারতীয় ভূমিতে পদক্ষেপ করিবার

কল্পনাও যে চীন করিতে পারে না, তাহা সুনিশ্চিত। সীমান্তের অন্যান্য এলাকার ন্যায় উক্ত এলাকায়ও চীনা সামরিক এবং বেসামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ মোতায়েন রহিয়াছেন কেবল নিজভূমি রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু ভারত সরকার সীমান্তের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবার অযৌক্তিক মনোভাবই শুধু প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু সীমান্তের পশ্চিম অঞ্চলে এমন একটি এলাকার উপর অধিকারের দাবি পেশ করিয়াছেন যাহা কোনোকালে ভারতের শাসনাধীন ছিল না। ইহাতে চীন সরকার এবং জনগণ সত্যই যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছেন।

চীন-ভারত মৈত্রী রক্ষার স্বার্থে, বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারত সরকারের সহিত এই সকল বিরোধ মীমাংসার আশায় চীন সরকার বরাবর চূড়ান্ত সংযম রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। মিগিতুনের দক্ষিণে এবং কংকা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ অঞ্চলে বারংবার ঘটনা ঘটাইবার পরেও, ভারতীয় সশস্ত্র সৈন্যদের চীনা ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ সত্ত্বেও, চীন সরকার আপসমূলক মনোভাবই বজায় রাখিয়াছেন, পরিস্থিতির অবনতি রোধ করিয়াছেন এবং কংকা গিরিবর্ত্মের ঘটনায় ধৃত ভারতীয় সশস্ত্র সৈনিকদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। তথাপি, বাস্তব ঘটনা উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় পক্ষ উদ্ধত তেজের বশবর্তী হইয়া দাবি করিতে থাকেন যে, উভয় ঘটনা চীনেরই প্ররোচনার ফল, বলা হয়—ধৃত ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার কবিয়াছে; এমনকি ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়া চীনকে পররাজ্য আক্রমণকারী, সাম্রাজ্যবাদী ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। এই ধরনের গুরুতর ব্যাপারে আমাদের জনগণ এবং সরকার যে অত্যন্ত পরিতাপ বোধ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গত ৭ই নভেম্বরের পত্রে আমি যে দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে আপনি স্বাগত জানাইয়াছেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নততর পরিবর্তনের আশা বাস্তবিক এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত।

সীমান্ত প্রশ্ন লইয়া আমাদের দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য আছে বটে, কিন্তু উহা কোনো প্রকারেই দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা বৈঠকের প্রতিবন্ধ হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। পরন্তু তাড়াতাড়ি এইরূপ বৈঠক সম্ভব করিয়া তোলাই যথার্থ প্রয়োজন, যাহাতে দুই পক্ষের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা মীমাংসার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট আলোচনার বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারে প্রথমে এইরূপ কিছু নীতি সংক্রান্ত মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। এইরূপ নীতি না থাকিলে সীমান্ত প্রশ্নে দুই পক্ষের সুনির্দিষ্ট আলাপ-আলোচনা অর্থহীন ও নিষ্ফল বিতর্কে পরিণত হইবার বিপদ দেখা দিতে পারে। অতএব আমি এই নির্দিষ্ট প্রস্তাব করিতেছি যে, দুই প্রধানমন্ত্রী ২৬শে ডিসেম্বর আলোচনা শুরু করুন। আপনি যদি অন্য কোনো তারিখ প্রস্তাব করেন, তাহাও আমি বিবেচনা করিতে সম্মত আছি।

আলোচনার স্থান সম্পর্কে, আপনি সম্মত হইলে চীনের যে কোনো স্থান নির্বাচন করা যায়, কেননা চীন-ভারত মৈত্রীর বিরোধী কোনো কার্যকলাপের অস্তিত্ব চীনে নাই; আপনি চীন সরকারের বিশিষ্ট অতিথিরূপেই আমাদের জনগণের নিকট সসম্মান সম্বর্ধনা লাভ করিবেন। চীনে আলোচনা করার যদি আপনার কোনো অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে বর্মা

সরকারের সম্মতি পাওয়া গেলে রেঙ্গুনে বৈঠকের স্থান স্থির করা যাইতে পারে।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমাদের দুইটি দেশেই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া এখনো অত্যন্ত পশ্চাদবর্তী। বর্তমান পশ্চাদবর্তী অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইবার জন্য স্বদেশে দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ নির্মাণ কর্মে আমাদের আত্মনিয়োগ করার প্রয়োজন জরুরি। আমাদের দুই মিত্র দেশের মধ্যে কিংবা অন্য কোনো দেশের সহিত উত্তেজনা সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নাই, এই উত্তেজনা দ্বারা স্বদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হইতে আমাদের দুই দেশের জনগণ এবং পৃথিবীর জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পরিস্থিতির এইরূপ গতিকে অনমনীয়ভাবে বাধা দিয়া চলিতেছে এমন প্রভাবশালী চক্রের সংখ্যাও দুনিয়ায় কম নয়। ইহারা আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, স্নায়ুযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথে বাধা স্থাপন করার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। ইহারা সমাজবাদী দেশগুলির শান্তি নীতির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিতেছে এবং সমাজবাদী দেশগুলির সহিত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির বিরোধ ও মনোমালিন্য উস্কাইয়া তুলিতেছে, এইসব কাজের দ্বারা উহারা লাভবান হইতে চায়। বর্তমানে চীন ও ভারতের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য সৃষ্টির জন্য তাহারা স্পষ্টতই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এমতাবস্থায় দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্রুত বৈঠক ও আলোচনার ব্যবস্থা করা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব; শুধু আমাদের দুই দেশের জনগণের প্রতি নয়, পরন্তু বিশ্ব-শান্তির জন্যও আমাদের এই দায়িত্ব অপরিহার্য।

গভীর শ্রদ্ধাসহ

(স্বাঃ) চৌ এন-লাই

চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী

চৌ এন-লাই-এর পত্রের জবাবে শ্রীনেহরুর পত্র

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

আপনার ১৭ই ডিসেম্বরের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। পিকিংস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপনার পত্রের পূর্ণ বিবরণ তারযোগে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমার ১৬ই নভেম্বরের পত্রে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যেসব প্রস্তাব ছিল তাহা আপনি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমি গভীরভাবে দুঃখিত। সীমান্ত সংঘর্ষের সকল প্রকার ঝুঁকি দূরীভূত করিয়া চীন-ভারত সীমান্তের উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য এবং সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই সকল প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

ইতিহাসের বিচারে, প্রচলিত প্রথার মাপকাঠিতে বা চুক্তি অনুযায়ী দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত এমন বিরাট অঞ্চলের উপর দাবি পুনরায় আপনার পত্রে উত্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রতিকালে চীনা বাহিনীর অনুপ্রবেশের ভিত্তিতে আপনি আপনার দাবি উত্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমি বিশেষভাবে দুঃখিত। চীনা বাহিনীর এই সকল অনুপ্রবেশের ফলেই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। আপনার নিকট প্রেরিত গত ২৬শে সেপ্টেম্বরের পত্রের এবং গত ৪ঠা নভেম্বরের আমাদের নোটের কোনো উত্তর আপনি পাঠান নাই। এই পত্রে ও নোটে অবস্থা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান তথ্য উল্লেখ করা হইয়াছিল।

আমি কেবল বলিতে চাই যে, ভারতীয় বাহিনী চীনের কোনো অঞ্চল অধিকার করিয়াছে, কিংবা কংকা গিরিপথে অথবা যে-লোংজুতে আমাদের প্রতিষ্ঠিত চেকপোস্টের উপর চীনা বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে সেইস্থানে ভারতীয় বাহিনী পররাজ্য আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া আপনি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

চ্যাং-চেনমো উপত্যকায় ভারতীয় রক্ষীবাহিনীর যে-সকল লোককে আটক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর 'বন্ধুর মতো' ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া আপনি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনের সীমান্ত বাহিনীর হস্তে বন্দী শ্রীকরম সিং ও তাঁহার সহকর্মীদের আপনারা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। শ্রীসিং ও তাঁহার সহকর্মীরা বন্দী অবস্থায় যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বিবৃতি দিয়াছেন। ভারতীয় বন্দীরা চীনা বাহিনীর হস্তে কিরূপ শোচনীয় দুর্ব্যবহার পাইয়াছেন এই বিবৃতি তাহা দেখাইয়া দিবে।

বিশদভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষের সরকারি কর্মচারীদের পরিচালনা করিতে পারে এমন নীতি নির্ধারণের জন্য এক চুক্তিতে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের উভয়ের ২৬শে ডিসেম্বর এক সাক্ষাৎকারের সুপারিশ আপনি করিয়াছেন। মহানুভব, গত ১৬ই নভেম্বরের পত্রে এবং ইহার পূর্বেও আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে সকল বিরোধ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধে এবং মীমাংসার পন্থা উদ্ভাবন সম্বন্ধে

আলোচনা করিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, তথ্যাবলী সম্বন্ধে যখন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন মত রহিয়াছে তখন নীতি সম্বন্ধে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাইব কি প্রকারে? সুতরাং পরবর্তী ব্যবস্থা কি হইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বরং গত ২৬শে সেপ্টেম্বরের আমার পত্রের ও ৪ঠা নভেম্বরের নোটের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করি। এই পত্রের ও নোটের উত্তর দিবেন বলিয়াও আপনি জানাইয়াছেন। অধিকন্তু আমি বলিতে চাই যে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রেঙ্গুন বা অন্য কোনো স্থানে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আপনার পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে আপনি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে কিছু না উল্লেখ করিয়াই আমার পত্র শেষ করিতে চাই। "দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমান অনগ্রসর অবস্থা হইতে উন্নত করাই" আমাদের দুই দেশের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত বলিয়া আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের দুই দেশের মধ্যে কিংবা বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত নয় বলিয়াও আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধেও আমি একমত। বিশ্বে উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে এবং "শান্তির অনুকূলে বিশ্বপরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটাইয়াছে"—ভারত এই ঘটনাসমূহকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। সাম্প্রতিক সকল ঘটনা সত্ত্বেও এবং আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বিশেষভাবে শেষোক্ত কারণে আমাদের সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হওয়া উচিত বলিয়া আমি বারবার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি।

শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

ইতি ভবদীয়
(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু

চীনে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতাবাসে প্রদত্ত চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী-বিভাগের মন্তব্য-লিপি

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯

চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী-বিভাগ চীনে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতাবাসকে অভিবাদন জানাইতেছেন এবং চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি নিবেদন করিয়া তাহা ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইতেছেন :

চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান যথার্থ পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক বিবরণ দিয়া এবং চীন সরকারের মনোভাব ও কর্মনীতি বিবৃত করিয়া প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ১৯৫৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। পরে, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ও চীন সরকার প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র ও ভারতীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী-বিভাগের ৪ঠা নভেম্বর তারিখের মন্তব্য-লিপি পান। সীমান্তের তথ্যাবলী সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের বিবরণের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া ঐ পত্রে ও মন্তব্য-লিপিতে ভারত সরকার জানাইয়াছেন।

ভারত সরকারের সঙ্গে ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে চীন সরকার সর্বদাই ইচ্ছুক এবং সীমান্তের প্রশ্নে, দুই পক্ষের মতামতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টায়, ধীর-স্থিরভাবে ও সৌহার্দ্যসহকারে এবং নিজের পক্ষে ও অন্যান্যের পক্ষেও ন্যায্য মনোভাব লইয়া ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করিতে চীন সরকার সর্বদা ইচ্ছুক। চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নটি যে জটিল, তাহা বিবেচনা করিয়া এবং পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে মীমাংসা ঘটনা অত্যন্ত কঠিন হইবে বলিয়া, অধিকতর কার্যকরভাবে মত-বিনিময় করিয়া মতৈক্যে পৌঁছিবার জন্য দুই দেশের সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে, সর্বাগ্রে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে দ্রুত মুখোমুখি আলোচনা হওয়া দরকার বলিয়াই চীন সরকার বরাবর মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, যেহেতু উভয়পক্ষের মধ্যে পরামর্শ করিয়া প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কাজটি এখনও বাকি রহিয়াছে এবং অধিকন্তু যেহেতু সীমান্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী সংক্রান্ত উপরে-উল্লিখিত পত্র ও মন্তব্য-লিপির কোনো কোনো অংশের কোনো জবাব চীন সরকার দেন নাই বলিয়া ভারত সরকার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, সেইহেতু চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী-বিভাগ এই মর্মে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রীয় বিভাগের ৪ঠা নভেম্বর তারিখের মন্তব্য-লিপিতে উল্লিখিত সীমান্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী সংক্রান্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নের উপর এই বিভাগকে আরও মতামত জানাইতে হইবে।

চীন ও ভারত হইল বৃহৎ দুইটি শান্তিপ্রিয় দেশ। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতের দিক দিয়া উভয়েরই বহু বিরাট

অভিন্ন কর্তব্য রহিয়াছে। চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব শুধু উভয় জনগণের স্বার্থেই নহে, বিশ্ব-শান্তির এবং বিশেষত এশিয়ার শান্তির স্বার্থে। তাই, সীমান্তের প্রশ্ন লইয়া ভারত সরকারের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতে চীন সরকার অত্যন্ত অনিচ্ছুক। দুর্ভাগ্যবশত, চীন-ভারত সীমান্ত কখনও নির্ধারিত হয় নাই। ব্রিটেন এ বিষয়ে কিছু বিরোধের জের রাখিয়া গিয়াছে, অধিকন্তু, চীনের বিরুদ্ধে কতকগুলি গ্রহণযোগ্য-নয় এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ভারত সরকার এইসকল তর্কবিতর্ক অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। যেহেতু ভারত সরকার সীমান্তের প্রশ্নে প্রভূত খুঁটিনাটি তথ্যাদি উপস্থিত করিয়াছেন, সেইহেতু, যথাসাধ্য সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিয়াও, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র ও দুই পক্ষের মতামত পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এই জবাবে উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই বলিয়া চীন সরকার দুঃখিত।

সুবিধার জন্য, নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে, একদিকে চীনের সিন্‌কিয়াং ও তিব্বত এবং অপরদিকে লাদাক— এই দুই-এর মধ্যে সীমান্তের যে-অংশ রহিয়াছে, তাহাকে পশ্চিমাংশ বলা হইবে; পশ্চিমাংশের দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত হইতে চীন, ভারত ও নেপালের সঙ্গমস্থল অবধি সীমান্তকে বলা হইবে মধ্যাংশ এবং সীমান্তের যে-অংশ ভুটানের পূর্বে, তাহাকে বলা হইবে পূর্বাংশ।

প্রশ্ন ১

চীন-ভারত সীমান্ত যথারীতি নির্ধারিত হইয়াছে কি?

চীন-ভারত সীমান্ত লইয়া বর্তমানে যে কিছু কিছু বিরোধ রহিয়াছে, তাহার কারণ হইল এই যে, দুই দেশ কখনও এই সীমান্তকে যথারীতি নির্ধারণ করে নাই এবং সীমান্ত সম্বন্ধে দুই দেশের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রহিয়াছে। ভারতীয় মানচিত্র অনুসারে পশ্চিমাংশের যে সীমারেখা, তাহা চীনা ভূখণ্ডের অনেক ভিতরে প্রবেশ করিয়া ৩৩,০০০ বর্গ-কিলোমিটারের অধিক আয়তনের একটি এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; মধ্যাংশে সীমারেখাটি চীনা মানচিত্রে যেরূপ চিহ্নিত অপেক্ষাকৃতভাবে তাহার কাছাকাছি, কিন্তু তবু বরাবরই চিনেরই অন্তর্গত এরূপ কতকগুলি এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; পূর্বাংশে সমগ্র সীমারেখাটি উত্তরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা গোড়ায় চীনের ছিল এইরূপ ৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতএব, যুক্তিসম্মত মীমাংসা করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া চীন সরকার মনে করেন। কিন্তু ভারত সরকারের বিবেচনায়, বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমারেখার বৃহত্তর অংশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট, কাজেই, ভারত সরকার সীমান্ত লইয়া কোনো সামগ্রিক আলাপ-আলোচনার কাজটাতেই বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সীমান্তের বিরোধটি দীর্ঘকাল অচলাবস্থায় পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। চীন সরকার মনে করেন যে, চীন-ভারত সীমান্তের বৃহত্তর অংশই আন্তর্জাতিক চুক্তিবলে যথারীতি নির্ধারিত হইয়াছে, এমন কথা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন। চীন সরকার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিতে চাহেন :

(১) পশ্চিমাংশ সম্বন্ধে। ভারত সরকার মন করেন যে, চীনের তিব্বত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ও কাশ্মীরী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৮৪২ সালে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারত সরকারের দাবি অনুযায়ী সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়।

কিন্তু, প্রথমত, এই সন্ধিচুক্তিতে শুধু ইহাই বলা হয় যে, লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত যেরূপ ছিল তাহাই বজায় রাখা হইবে এবং উভয়পক্ষ নিজ নিজ সীমানার মধ্যে থাকিবেন—পরস্পরের উপর অনধিকার প্রবেশ হইতে বিরত থাকিবেন। সীমান্তের সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্বন্ধে ঐ সন্ধিচুক্তিতে কোনো ব্যবস্থা বা কোনো প্রকারের আভাসও ছিল না, সীমান্তের অবস্থান দীর্ঘকাল যাবৎ স্থির রহিয়াছে—এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের নিকট লিখিত পত্রে যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কোনো যুক্তির দ্বারাই ভারত সরকার বর্তমানে যে সীমারেখা দাবি করিতেছেন তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, ১৮৪২ সালের সন্ধিচুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল চীনের তিব্বত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ও কাশ্মীরী কর্তৃপক্ষের মধ্যে, কিন্তু, চীনের সিন্‌কিয়াং ঐ সন্ধিচুক্তির অংশীদার নয় এবং ভারত সরকার এখন যে এলাকা লইয়া বিতর্ক তুলিয়াছেন তাহার বৃহত্তম অংশই

(শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ) চীনের সিন্‌কিয়াং-এর অংশ। এই সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী বিচারে সিন্‌কিয়াং-এর বিশাল বিশাল এলাকা আর চীনের না থাকিয়া লাদাকের অংশ হইয়া পড়িয়াছে, এমন বিবেচনা করা স্পষ্টতই অচিন্তনীয়। একদিকে লাদাক ও কাশ্মীর এবং অপরদিকে সিন্‌কিয়াং-এর মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৯ সালে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে কোনো ফল হয় নাই। কোনো একতরফা প্রস্তাবের দ্বারা পরদেশের ভূখণ্ড দখল করা যায়, এরূপ বিবেচনা করাও অচিন্তনীয়।

তৃতীয়ত, চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাংশ যে নির্ধারিত নহে, তাহা দেখাইবার মতো স্পষ্ট, তর্কাতীত প্রমাণ আছে বহু। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় : (ক) লাদাক ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করিবার কথা বলিয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার ১৯২১ হইতে ১৯২৭ সালের মধ্যে বহুবার চীনের তিব্বত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোনো ফল হয় নাই। তখন দুই পক্ষের মধ্যে যে বহু দলিল-বিনিময় হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়; ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন যে স্যার আর্থার লোথিয়ান নামে ব্রিটন্, ১৯৫৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার পত্র হইতেও ইহা ঠিক বলিয়া সাব্যস্ত হয়। (খ) চীন সরকারের হাতে এখন যেসব তথ্য আছে তদনুসারে, সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত সরকারি মানচিত্রেও চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাংশে আদৌ কোনো সীমারেখা টানা হয় নাই। সরকারি ভারতীয় মানচিত্রের ১৯৫০ সালের সংস্করণে সীমারেখার বর্তমান ভাষ্যটিকে অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণরূপে দেখান হয়; কিন্তু তখনও "সীমান্ত অনির্দিষ্ট"—এই কথা দ্বারা উহা চিহ্নিত ছিল। সীমান্তের এই অনির্ধারিত অংশটি সহসা নির্ধারিত সীমান্ত হইয়া গিয়াছে মাত্র ১৯৫৪ সাল হইতে। (গ) ১৯৫৯ সালের ২৮শে আগস্ট ভারতের লোকসভায় সীমান্তের এই অংশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করিয়াছিলেন : 'ইহাই ছিল তিব্বত ও চীনা-তুর্কিস্তানের সঙ্গে পুরানো কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্ত। কেহ ইহা চিহ্নিত করে নাই।" সীমান্তের এই অংশ দীর্ঘকাল পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে—এরূপ মন্তব্যের সহিত উপরে-উল্লিখিত যাবতীয় তথ্যের কোনোই মিল নাই। ভারত সরকারের বিবেচনায়, সীমান্তের এই অংশটি ১৮৪২ বা ১৮৯৯ সালে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভারত সরকারই উহা নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯২১ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সমানে আলাপ-আলোচনার কথা বলিতে থাকিবেন, কোনো নির্ধারিত সীমান্ত নাই বলিয়া তাঁহারা ১৯৪৩ সালেও স্বীকার করিবেন, ১৯৫০ সালেও তাঁহারা সীমান্ত অনির্ধারিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং সীমান্তটি কেহ চিহ্নিত করে নাই বলিয়া সেই সরকারই ঘোষণা করিবেন ১৯৫৯ সালেও, এইসব ব্যাপার অচিন্তনীয়।

(২) মধ্যাংশ সম্বন্ধে। ভারত সরকার মনে করেন যে, উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের পথ হিসাবে এই এলাকার ছয়টি গিরিপথ ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তির ৪র্থ ধারায় যেভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার ফলে, ভারত সরকারের মতে সীমান্তের এই অংশ সম্বন্ধে চীন সরকারের সম্মতি সূচিত হইয়া গিয়াছে। চীন সরকার মনে করেন, এমন কথা বাস্তব বিচারে এবং যুক্তির দিক দিয়াও টিকে না।

১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তিতে কিংবা উহা লইয়া আলাপ-আলোচনাকালেও দুই দেশের মধ্যে সীমান্তের প্রশ্নটি আদৌ বিবেচনার মধ্যে আসে নাই। ঐ চুক্তির ৪র্থ ধারা সম্বন্ধে চীনা পক্ষের খসড়ায় লেখা হইয়াছিল যে, "উভয়পক্ষের ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য চীনের তিব্বত অঞ্চলের আরি জেলায় নিম্নলিখিত গিরিপথগুলি খুলিতে চীন সরকার সম্মত হইতেছেন।" ভারতীয় পক্ষ চীনা খসড়ার সহিত একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহাদের নিজস্ব খসড়ায় লেখা ছিল : "নিম্নলিখিত স্থান ও গিরিপথের উপর দিয়া যে-পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া ভারত ও পশ্চিম তিব্বতের ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা যাইতে পারিবেন।" পরে উভয়পক্ষ লেখাটি বদলাইয়া নিম্নলিখিতরূপে লেখাতে একমত হইলেন : "উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা নিম্নলিখিত গিরিপথগুলি ও পথগুলি দিয়া পর্যটন করিতে পারিবেন।" যেভাবে লেখাটি গৃহীত হইল, তাহাতে যে গিরিপথগুলির মালিকানার প্রশ্ন জড়িত থাকিল না—শুধু এই কনসেশনটাই চীন সরকার দিলেন। দুই দেশের মধ্যে সীমান্তের এই অংশটা এইভাবে নির্দিষ্ট হইয়া গেল, এমন সিদ্ধান্ত কেহ ইহা হইতে করিতে পারেন না। চীনের প্রতিনিধি সহকারী পররাষ্ট্র সচিব চাং হান্-ফু বরং ১৯৫৪ সালের ২৩শে এপ্রিল ভারতীয় প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মিঃ এন. রাঘবনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, চীন সরকার এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে সীমান্তের প্রশ্নকে আনিতে চাহেন না। রাষ্ট্রদূত এন. রাঘবনও তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। অতএব, চীন সরকার দৃঢ়তা-সহকারে বলিতে চাহেন যে, সীমান্তের এই অংশ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহা নির্ধারণের জন্য কোনো আলাপ-আলোচনা চালাইবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিবার কোনো হেতু নাই।

(৩) পূর্বাংশ সম্বন্ধে। ভারত সরকার বলিতেছেন যে, ব্রিটেন, চীন ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের যুক্ত অংশগ্রহণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সিমলা সম্মেলনের ফল হইল তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা। অতএব উহা বলবৎ আছে। চীন সরকারের বিবেচনায়, তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটি সম্পূর্ণই বে-আইনি এবং ভারত সরকারের বক্তব্যটি চীন সরকারের পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রথমত, সিমলা নিয়মপত্র যে আইনগতভাবে সিদ্ধ নহে, তাহা পৃথিবীতে বিদিত। সিমলা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চীনা প্রতিনিধি ইভান চেন্ সিমলা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং কেবল তাহাই নহে—তখন বা পরে ব্রিটেন ও তিব্বতের মধ্যে কোনো সন্ধিচুক্তি বা অনুরূপ কোনো দলিল স্বাক্ষরিত হইলে, তাহা চীন সরকার স্বীকার করিবেন না বলিয়া তিনি (ইভান চেন্) চীন সরকারের নির্দেশ অনুসারে ১৯১৪ সালের ৩রা জুলাই সিমলা সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্রিটেনে চীন সরকারের মন্ত্রী লিউ ইয়াক্ লিং ঐ বৎসরই ৩রা ও ৭ই জুলাই ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে প্রদত্ত লিখিত মন্তব্য লিপিতেও অনুরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন হইতে সমস্ত চীন সরকার এই মনোভাবেই দৃঢ় ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অতীতে কোনো কোনো চীন সরকারের দ্বারা যে সব নোংরা অসম সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ইতিমধ্যেই সে সমস্ত বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তেমনি ভারতও সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন হইতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন; সেই ভারতের সরকার কেন যে তাঁহার মিত্র

চীনের সরকারকে এমন একটি অসম সন্ধিচুক্তি মানিয়া লইবার জন্য জিদ করিতেছেন, যাহাতে চীন সরকার স্বাক্ষরও দেন নাই—তাহা দেখিয়া চীন সরকার হতবুদ্ধি হইয়া যাইতেছেন।

দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত লইয়া সিমলা সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল; ঐ সম্মেলনে ভারত ও তিব্বতের মধ্যকার সীমান্ত লইয়া আলোচনা করিতে তখন বা পরে কখনও চীন সরকার আপত্তি জানান নাই; অতএব, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ম্যাকমোহন সীমারেখা সম্বন্ধে ঐ সম্মেলন হইতে যে মতৈক্য ঘটিয়াছিল, তাহা চীনের পক্ষে অবশ্য-পালনীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই যুক্তিধারাটি প্রথম হইতে শেষ অবধি বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। প্রকৃতপক্ষে, কেবল তিব্বত অঞ্চল ও বাদবাকি চীনের মধ্যকার সীমান্ত এবং তথাকথিত বহির্তিব্বত ও অন্তর্তিব্বতের মধ্যকার সীমান্ত লইয়াই সিমলা সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল; চীন ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত লইয়া এই সম্মেলনে কখনও আলোচনা হয় নাই। তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার সীমান্তটি হইল ১৯১৪ সালের ২৪শে মার্চ দিল্লীতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ও তৎকালীন তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির মধ্যে গোপন পত্র-বিনিময়ের ফল। উহা কোনো প্রকারেই চীনকে জানান হয় নাই। ইহার আরও অর্থ হইল এই যে, সিমলা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইহা কখনও উপস্থিত করা হয় নাই। সিমলা নিয়মপত্রের সহিত সংযোজিত মানচিত্রে প্রদর্শিত লাল রেখার একাংশের সহিত তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার মিল আছে; কিন্তু তিব্বত ও বাদবাকি চীনের মধ্যকার সীমান্ত হিসাবেই ঐ লাল রেখাটি টানা হইয়াছিল; লাল রেখাটির একাংশ যে চীন ও ভারতের মধ্যের সীমান্ত, এমন কথা কখনও বলা হয় নাই। চীন-ভারত সীমান্ত সংক্রান্ত তথাকথিত প্রশ্নটি যেহেতু সিমলা সম্মেলনে ও সিমলা নিয়মপত্রে কখনও ছিল না, তাই চীন সরকারের স্মারকলিপিতে এবং সিমলা নিয়মপত্র পরিবর্তন করাইবার প্রস্তাবে চীন সরকার স্বভাবতই এই প্রশ্ন (চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্ন—অনুবাদক) বা তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নাই—ইহা ভারত সরকার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার অস্তিত্বের বিষয়ই চীন সরকারের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। সীমারেখাটি আইনসম্মত বা চীন সরকারের দ্বারা গৃহীত, এমন কিছু ইহা দ্বারা কোনোক্রমেই প্রমাণিত হয় না। এইভাবে দেখা যায় যে, তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটি সিমলা নিয়মপত্র অপেক্ষাও বেশি বিশ্রী এবং উপস্থিত করিবার পক্ষে বেশি অযোগ্য এবং ইহাকে চীন সরকারের অবশ্য-স্বীকার্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে, তাহা বাস্তবিক আরও অদ্ভুত কথা হয়। চীন সরকার ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নটি এবং বিশেষত তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার প্রশ্নটি কখন এবং কিসের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন একটি বিশেষ তারিখ বা নিয়মপত্রের কোনো বিশেষ ধারা সিমলা সম্মেলনের সমগ্র কার্যবিবরণের মধ্যে ভারত সরকার দেখাইতে পারেন কিনা।

অধিকন্তু, তিব্বতের সঙ্গে পৃথক আলাপ আলোচনা চালাইবার কোনো অধিকার যে

ব্রিটেনের নাই, তাহা যে সন্দেহাতীত, সে-কথাও উল্লেখ করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, চীন সরকার এই মর্মে বারবার বিবৃতি দিয়াছেন; ব্রিটিশ সরকার সম্বন্ধে কথা হইল এই যে, চীন সরকারের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে ব্রিটিশ সরকার তিব্বতের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ও পুরানো রুশ সরকারের মধ্যে তিব্বত সম্পর্কে ১৯০৭ সালের যে-চুক্তি রহিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেও অবশ্যপালনীয়। অতএব, ব্রিটিশ সরকার এই যে সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, একমাত্র সেই চুক্তি অনুযায়ী বিচার করিলেও, ১৯১৪ সালে চীন সরকারকে লুকাইয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি ও তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে-গোপন পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহার কোনো আইনগত মর্যাদা নাই।

তৃতীয়ত, চীন সরকার ও ভারতের মধ্যে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা সম্বন্ধে চীন কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নাই বলিয়া জোর দিয়া যে-কথা বলা হইতেছে, তাহাও বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের কঠিনতমপর্যায়েই তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটি ক্রমে ক্রমে ও বেসরকারিভাবে ভারতীয় মানচিত্রে দেখা দেয়; এবং, ১৯৪৩ সালের পর তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নিয়ন্ত্রণের অধীন হইয়া পড়েন এবং কেন্দ্রীয় চীন সরকারের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক রীতিমতভাবে খারাপ হইয়া যায়। তবু, তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার দক্ষিণস্থ চীনা ভূখণ্ডে ব্রিটেন ক্রমে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া, কুওমিনটাঙ সরকার, জাপান-বিরোধী যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর ১৯৪৬ সালের জুলাই, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে এবং ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে—এই চারবার চীনে ব্রিটিশ দূতাবাসের নিকট মন্তব্য-লিপি পাঠাইয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ব্রিটেন ভারতের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরিত করায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুওমিনটাঙ সরকার চীনের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসকে মন্তব্য-লিপি পাঠাইয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এমনকি, ১৯৪৯ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখেও, তখনও ভারত সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল যে চিয়াং-কাই-শেক চক্রের তাহার ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত পো-চিয়া-লুন্ সিমলা নিয়মপত্রটিকে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী বিভাগে একখানি মন্তব্য-লিপি দিয়াছিলেন; ভারত সরকারের বিবেচনায় ঐ নিয়মপত্র বৈধ ছিল। ভারত সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার পর চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র বারবার বলিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত নির্ধারিত হয় নাই। ১৯৫৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চীন আগমনকালে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত নির্ধারণের কাজটি বাকি আছে। প্রধানমন্ত্রী চৌ আরও বলিয়াছিলেন যে, চীন সরকার তখনও চীনের সীমান্তসমূহের জরিপের কাজে হাত দেন নাই, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে পরামর্শও করেন নাই, এই কারণেই চীনা মানচিত্রগুলিতে পুরানো মানচিত্রে অঙ্কিত সীমান্তই রাখা হয় এবং চীন সরকার নিজের মতানুযায়ী এই সীমান্তচিহ্নে পরিবর্তন করিবেন না। ১৯৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বিভাগ হইতে চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তাহা আবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, গুপ্ত চক্রান্তের ফল ঐ

যে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখাটি, তাহাকে তিব্বতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষও যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে করেন নাই। এই সীমারেখা সম্পর্কে তাঁহারা বারবার আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং সীমারেখাটির দক্ষিণস্থ দখল-করা চীনা ভূখণ্ডটি প্রত্যর্পণের জন্য তাঁহারা বলিয়াছিলেন। এমনকি ভারত সরকার ইহা অস্বীকার করেন না।

চতুর্থত, চীন ও ভারতের মধ্যকার তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখার সীমান্তটিকে চীন সরকার তো কখনও স্বীকৃতি দেনই নাই; কিন্তু কেবল তাহাই নহে—ভারতীয় ও ব্রিটিশ সরকারও বহুকাল যাবৎ উহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত "তিব্বত ও সন্নিহিত দেশগুলি" নামক সরকারি মানচিত্রটিতে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা অনুযায়ী সীমান্ত অঙ্কিত হয় নাই; ব্রিটেনের রাজার মানচিত্র-রচয়িতা জন বার্থোলোমিউ কর্তৃক সংকলিত 'অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড্ অ্যাটলাস—১৯৪০'-র ষষ্ঠ সংস্করণে "ভারত" মানচিত্রেও ঐ সীমারেখা গ্রহণ করা হয় নাই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্তৃক লিখিত ও ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত "দি ডিস্কভারি অব্ ইণ্ডিয়া"র ১৯৫১ সালের ৩য় ইংরেজী সংস্করণে সংযোজিত "ইণ্ডিয়া, ১৯৪৫" মানচিত্রেও চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাংশ অঙ্কনে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা অনুসরণ করা হয় নাই। ১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের সরকারি মানচিত্রে তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা টানা হইলেও, তখনও উহা অনির্দিষ্ট চিহ্নিত ছিল। ব্রিটেনের রাজার মানচিত্র-রচয়িতা জন্ বার্থোলোমিউ কর্তৃক সম্পাদিত "টাইমস্ অ্যাটলাস অব্ দি ওয়ার্ল্ড"-এ "চায়না ওয়েস্ট অ্যান্ড টিবেট" মানচিত্রে ১৯৫৮ সাল অবধিও চিরাচরিত চীন-ভারত সীমারেখা ও তথাকথিত ম্যাকমোহন সীমারেখা উভয়ই অঙ্কিত হয় এবং দুই সীমারেখার মাঝখানে "বিসংবাদিত এলাকা" কথা দুইটি মুদ্রিত ছিল। সীমান্তের এই অংশ নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের যে-যুক্তি তাহা এই সকল প্রমাণ্য তথ্যের দ্বারা পুরোপুরি খণ্ডিত হয়। ভারত সরকার তর্ক তোলেন যে, অন্তর্তিব্বতের অবস্থা ও সীমানা সম্বন্ধে একটা মতৈক্য হইবে এই আশায় ব্রিটিশ সরকার সিমলা নিয়মপত্রের প্রকাশনী বছরের পর বছর বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই কথায় যে ভারত সরকারকে মুশ্কিল হইতে পার পাইতে সাহায্য করে না, তাহা ইতিমধ্যেই উপরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অধিকন্তু, ঐ কথায় বরং ভারত সরকারের নিয়মপত্র সম্বন্ধে কোনো মতৈক্যে পৌঁছান যায় নাই, সেক্ষেত্রে সিমলা নিয়মপত্রের কি অর্থ থাকিতে পারে? তাহার উপর আবার খাস নিয়মপত্রটিই যখন বৈধতা লাভ করে নাই, সেক্ষেত্রে তথাকথিত যে চীন-ভারত সীমারেখা চীন সরকারের নিকট কখনও প্রস্তাবিতও হয় নাই এবং ইংরাজরা যাহা একতরফাভাবে নিয়মপত্রে বে-আইনিভাবে প্রবিষ্ট করাইতে চাহিয়াছিল, তাহার সপক্ষে আর কি বলা যায়? প্রকৃতপক্ষে, যেসব ব্রিটিশ কর্মকর্তা একদিন ভারতের উচ্চ-পদাধিকারী ছিল, তাহারা কোনোক্রমেই চীন-সমর্থক না হইলেও, ম্যাকমোহন সীমারেখাটিকে আইনত অসিদ্ধ ও বাস্তবে অকার্যকর বলিয়া স্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৯ সালে ভারতের আসামের যিনি অস্থায়ী গভর্নর ছিলেন সেই হেন্‌রি টোয়াইনাম ১৯৫৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর লণ্ডন 'টাইম্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে প্রমাণ দিয়াছেন যে, এই সীমারেখার "অস্তিত্ব এখনও নাই এবং কখনও ছিলও না"।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত তর্কাতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়; পশ্চিমাংশ হউক, মধ্যাংশ হউক বা পূর্বাংশ হউক, সমগ্র চীন-ভারত সীমান্ত নির্ধারিত হয় নাই। ভারত সরকারের ভিত্তি হইল ১৮৪২ সালের সন্ধিচুক্তি; সেই সন্ধিচুক্তিতে চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাংশে কোনো সীমারেখা নির্দেশ করে নাই, অধিকন্তু সীমান্তের এই অংশে সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট হইল চীনের সিন্‌কিয়াং অঞ্চল—সেই সিন্‌কিয়াং এই সন্ধিচুক্তিতে কোনো পক্ষ হিসাবে ছিল না। ভারত সরকারের ভিত্তি হইল ১৯৫৪ সালে চুক্তি—তাহাতে চীন-ভারত সীমান্তের মধ্যাংশ কিংবা অন্য কোনো অংশও সংশ্লিষ্ট ছিল না। ১৯১৪ সালের যে-নিয়মপত্র ভারত সরকারের ভিত্তি, সেই নিয়মপত্রেরই কোন আইনগত মর্যাদা নাই এবং ১৯১৪ সালের সম্মেলনে চীন-ভারত সীমান্ত লইয়া কখনও আলোচনা হয় নাই। চীন-ভারত সীমান্ত নির্ধারণ করিবার কাজ যে এখনও বাকি আছে, তাহা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় ও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তর্কাতীত প্রমাণ হইতেও তাহা সমর্থিত হয়। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে উভয়পক্ষের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক যুক্তিসম্মত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়া কোনো পথ নাই।

প্রশ্ন ২
চিরাচরিত প্রচলিত চীন-ভারত সীমারেখা কোথায়?

চীন-ভারত সীমান্ত যদিও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নাই, তবু, চিরাচরিত একটা প্রচলিত সীমারেখার অস্তিত্ব, অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে উভয়পক্ষ যে পর্যন্ত এক্তিয়ার খাটাইয়াছেন তদনুসারে গঠিত একটা সীমারেখার অস্তিত্ব উভয়পক্ষ স্বীকার করেন। চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখার অবস্থান সম্পর্কে দুই পক্ষের ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন—ইহাই বর্তমান প্রশ্ন। নিজেদের মানচিত্রে সীমান্ত (প্রধানত পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ) অঙ্কনে ভারত সরকার তাঁহাদের মূল প্রকৃত এক্তিয়ারের জায়গা অতিক্রম করিয়া বহুদূর গিয়াছেন; ভারত সরকার জোর দিয়া বলেন, ইহার ভিত্তি হইল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি এবং কেবল তাহাই নহে—ইহাই চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা। চীন সরকারের বিবেচনায়, প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রগুলিতে চীন-ভারত সীমান্ত যেভাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহা চীনা মানচিত্রে প্রদর্শিত চিহ্ন হইতে যথেষ্ট পৃথক এবং—উপরেও বলা হইয়াছে—উহা কোনো আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে অঙ্কিত নহে, অধিকন্তু, বরাবরের আচরণ ও প্রচলনের ভিত্তিতেও উহা অঙ্কিত নহে।

(১) পশ্চিমাংশ সম্বন্ধে। ৩৩,০০০ বর্গ-কিলোমিটারের অধিক আয়তনের যে-এলাকা লইয়া ভারত এখন তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা বরাবরই চীনের। চীনা সরকারি দলিলপত্র ও নথিপত্র হইতে তাহা চূড়ান্তভাবেই সমর্থিত হয়। হালে কয়েক বছরের মধ্যে ভারত কর্তৃক অধিকৃত অতি ক্ষুদ্র পারিগাস্ এলাকাটি ছাড়া বাদবাকি বিস্তীর্ণ এলাকা বরাবরই কার্যকরীভাবে চীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই এলাকার প্রধান অংশ চীনের সিন্‌কিয়াং-উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের হোতিয়েন কাউন্টির এক্তিয়ারভুক্ত এবং গৌণ অংশটি চীনের স্বায়ত্তশাসিত তিব্বত অঞ্চলের রুদক জং-এর অধীনস্থ। জনবিরল হইলেও, এই এলাকাটি বরাবরই সিন্‌কিয়াংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী উইঘুর ও কিরঘিজদের এবং তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী তিব্বতীদের একাংশের গোচারণভূমি ও লবণ তুলিবার স্থান। এই এলাকার বহু স্থানের নাম উইঘুর ভাষায়। যেমন, সিন্‌কিয়াংয়ের হোতিয়েন কাউন্টির অংশ আক্‌সাই চিন-এর অর্থ উইঘুর ভাষায় হইল : "শ্বেত-প্রস্তরের মরুভূমি"। আবার, এই এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত যে কারকাশ নদী আছে, তাহার অর্থ উইঘুর ভাষায়—"কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের নদী"।

সিন্‌কিয়াং ও পশ্চিম তিব্বতের মধ্যে সংযোগরক্ষী একমাত্র যানবাহন-পথ হইল এই এলাকাটি, কেননা ইহার উত্তর-পূর্ব রহিয়াছে সিন্‌কিয়াংয়ের বিস্তীর্ণ গোবি মরুভূমি—তাহার মধ্য দিয়া তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি যানবাহন ব্যবস্থা কার্যত অসম্ভব। অতএব, এই এলাকায় এক্তিয়ার খাটাইবার জন্য ও এখানে টহলদারির জন্য অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে চীনের চিং রাজবংশের সরকার বিভিন্ন 'কারেন' (তদারকী ফাঁড়ি) বসাইয়াছিলেন। চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে চীনের মুক্তির সময় অবধি দশকগুলিতে এই এলাকায় প্রহরারত ফৌজ থাকিয়াছে সব সময়। ১৯৪৯ সালে সিন্‌কিয়াংয়ের মুক্তির পর, এই এলাকার সীমান্তে প্রহরার কাজ কুওমিনটাং ফৌজের হাত হইতে গ্রহণ করে চীনের জন-মুক্তিফৌজ। ১৯৫০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তিব্বতে প্রবেশের জন্য চীন সরকার চীনা জন-মুক্তিফৌজের প্রথম সৈন্যদলগুলিকে পাঠাইয়াছিলেন এই এলাকারই মধ্য দিয়া। তখন হইতে গত নয় বছরে, আরি এলাকায় মোতায়েন চীনা ফৌজ সিন্‌কিয়াং হইতে নিয়মিতভাবে এবং প্রায়ই অবশ্যপ্রয়োজনীয় সরবরাহ আনিয়াছে এই এলাকার মধ্য দিয়া। ১৯৫৬ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীন সরকার প্রচলিত পথ বরাবর সিন্‌কিয়াংয়ের ইয়েহ্‌চেং হইতে তিব্বতের গারটক পর্যন্ত মোট ১,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক মোটর-রাস্তা নির্মাণ করেন; উহার ১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একাংশ এই এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে; ৩,০০০-এর বেশি বেসামরিক শ্রমিক এই রাস্তা নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই এলাকাটি যে চীনা ভূখণ্ড, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই অখণ্ডনীয় তথ্যগুলিই যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে।

ভারত সরকার দৃঢ়ভাবে এই কথা বলেন যে, এই এলাকাটি "গত দুই হাজার বছরের মতো কাল যাবৎ ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ভারতের জীবন ও চিন্তার একটি ঘনিষ্ঠ অংশ হইয়া আসিয়াছে"। কিন্তু প্রথমত, এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে ভারত সরকার পারেন নাই। ১৯৫৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতের রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু বরং বলিয়াছিলেন যে, এই এলাকাটি "কোনো প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন থাকে নাই"। ১৯৫৯ সালের ২৩শে নভেম্বর তিনি ভারতের রাজ্যসভায় আবার বলিয়াছিলেন : "আমি যতদূর জানি, তাহাতে, ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই এলাকায় কোনো জনবসতিও ছিল না, কোনো ফাঁড়িও ছিল না"। (সীমান্তের) চীনা পারে কিরূপ অবস্থা রহিয়াছে, তাহা সঠিকভাবে বিচার করা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পক্ষে সম্ভব না হইলেও, ভারত যে কখনও এই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ খাটায় নাই, ইহা তাঁহার কথা হইতে প্রামাণ্যভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার বলেন যে, এই এলাকায় তাঁহারা নিয়মিতভাবে টহলদার পাঠাইয়া আসিতেছেন এবং ইহা হইল ভারতের এক্তিয়ার খাটাইবার একটি উপায়। তবে, চীন সরকারের হস্তগত তথ্য অনুসারে, পর্যবেক্ষণ চালাইবার জন্য সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর এই এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র তিন বার : ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে এবং ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে; প্রতিবারই চীনা সীমান্তরক্ষীগণ উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আটক করিয়া বাহিরে প্রেরণ করে। এই তিনবার অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কখনও তাহারা এই এলাকায় যায় নাই। ঠিক এই কারণেই, এই এলাকায় চীনা লোকলস্করের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভারত সরকার এমনই অনবহিত ছিলেন যে, তাঁহারা বলে, চীনা লোকলস্কর এই এলাকায় প্রথম প্রবেশ করে ১৯৫৭ সালে।

তৃতীয়ত, চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা হিসাবে নিজেরা যাহা বলিতে চাহেন, তাহার সমর্থনে ভারত সরকার কতকগুলি মানচিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দিক দিয়াও অবস্থাটা ভারতের যুক্তির অনুকূল নহে। কোনো কোনো স্থলে সামান্য কিছু কিছু

গরমিল সত্ত্বেও, গত এক হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে চীনে প্রকাশিত মানচিত্রগুলিতে সীমান্তের পশ্চিমাংশ মোটামুটি একইভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ১৮৯৩ সালে একটি সরকারি চীনা মানচিত্রে সীমান্তের পশ্চিমাংশ যেভাবে চিহ্নিত আছে, তাহা মোটামুটি ভারতীয় মানচিত্রেরই অনুরূপ—এই কথা ভারত সরকার বলিয়াছেন। এখানে কোন্ মানচিত্রের কথা বলা হইতেছে, তাহা চীন সরকার জানেন না, কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁহারা মন্তব্য করিতে পারেন না। ব্রিটিশ মালিকানায় পরিচালিত 'নর্থ চায়না ডেইলি নিউজ অ্যান্ড হেরাল্ড' পত্রিকা কর্তৃক ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 'অ্যাটলাস' সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহাতে কেবল ব্রিটিশ মতামতই ব্যক্ত হইতে পারে, চীনা মতামত নহে এবং তাহা লইয়া এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ইহার সহিত অপর দিকের ব্যাপারটা দেখুন। গত শতাব্দীতে বা আরও পূর্বে ব্রিটেনে ও ভারতে প্রকাশিত মানচিত্রগুলিতে সীমান্ত চিহ্নিত করিবার ব্যাপারে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। ইহার কারণ হইল এই যে, কাশ্মীর দখল করিবার পর ব্রিটেন চীনের দক্ষিণ সিন্‌কিয়াং ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে কাশ্মীরকে ব্যবহার করিবার জন্য সক্রিয় চেষ্টা চালাইয়াছিল এবং কাজেই, ব্রিটেন পশ্চিমাংশের চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখায় অনবরত খামখেয়ালী পরিবর্তন ঘটাইত এবং এই উদ্দেশ্যে চীনে অনধিকার প্রবেশের জন্য জরিপ-দলগুলিকে পাঠাইত। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন যে, জরিপাদির পর মাত্র ১৮৬৫ সাল হইতে "সঠিক" মানচিত্র, অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রের সদৃশ মানচিত্র সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু, সেক্ষেত্রেও কোনো কোনো যশস্বী জরিপকারী যথেচ্ছ তথ্যবিকৃতি ঘটাইতে চাহেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে যে দুইজন জরিপকারীর নাম উল্লেখ আছে, অর্থাৎ ১৮৭০ সালের "স্কেচ ম্যাপ অব্ ইস্টার্ন টার্কিস্তান"-এ জি. ডব্লিউ. হেওয়ার্ড এবং ১৮৭১ সালের "স্কেচ ম্যাপ অব্ দি কান্ট্রি নর্থ অব্ ইণ্ডিয়া"'য় রবার্ট শ', ইঁহারা যেভাবে সীমান্ত চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহা চীনা মানচিত্রে প্রদর্শিত চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখার কাছাকাছি। 'জার্নাল অব্ দি ব্রিটিশ রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি'তে—খণ্ড ৪০, ১৮৭০—লিখিত প্রবন্ধে হেওয়ার্ড স্কট বলিয়াছেন, "সীমান্তটি গিয়াছে কারাকোরাম পর্বতের প্রধান পর্বতশ্রেণী বরাবর ও চাং-চেন-মোর গিরিপথগুলি অবধি", অর্থাৎ প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রে নহে, বরং চীনা মানচিত্রেই সীমান্তের এই অংশ সঠিকভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। একটি বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন তথ্য এই যে, সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক সংকলিত সরকারি মানচিত্রের ১৯৪৩ সালের সংস্করণেও সীমান্তের এই অংশের "সঠিক" সীমারেখা তো নয়ই, আদৌ কোনো সীমারেখাই টানা হয় নাই। ভারতের ১৯৫০ সালের মানচিত্রে, ভারত কর্তৃক বিতর্কমূলক এলাকাটিতে কাশ্মীরের মতো একই রঙ লাগান হইলেও, তাহাতেও কোনো সীমারেখা টানা হয় নাই; "সীমান্ত অনির্দিষ্ট"—এই কথা দুইটি তাহাতে লেখা আছে। এই তথ্য আগেই উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

চতুর্থত, ভারত সরকার বলেন, তাঁহারা যে-বিরোচিত প্রচলিত সীমারেখা দাবি করেন, তাহার আবার সুস্পষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ, উহা গিয়াছে জলবিভাজিকা বরাবর। তবে, শুরুতেই বলিতে হয় যে, সীমান্ত চিহ্নিত করিবার জন্য জলবিভাজিকারই

নীতি একমাত্র কিংবা প্রধান আন্তর্জাতিক নীতি নহে। পরদেশের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সীমারেখা স্থাপন করিবার চেষ্টার অজুহাত হিসাবে জলবিভাজিকার ব্যবহার বিশেষভাবে গর্হিত। তাহার পর, ভারত সরকার যে চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা দাবি করেন, তাহা হোতিয়েন নদী-ব্যবস্থা ও সিন্ধুনদ-ব্যবস্থার বিভাজক না হইয়া, প্রকৃতপক্ষে হোতিয়েন নদী-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই গিয়াছে। অপরপক্ষে, চীনা মানচিত্রগুলিতে প্রদর্শিত চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখায় এই এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়াছে; এই এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখে কোনো খাড়া ঢালু নাই, এলাকাটি সহজে অধিগম্য, কাজেই ইহা স্বভাবতই সিন্‌কিয়াং ও পশ্চিম তিব্বতের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে একমাত্র পথ। তবে, পশ্চিমে এই অঞ্চল ও লাদাকের মাঝখানে রহিয়াছে সুউচ্চ কারাকোরাম গিরিশ্রেণী, যাহা অত্যন্ত দুরধিগম্য। এলাকাটি যে লাদাক হইতে অত্যন্ত দুরধিগম্য, তাহা ভারত সরকারও স্বীকার করেন।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, সর্বকালের যথার্থ প্রশাসনিক এক্তিয়ারের দিক দিয়া কিংবা ভারত কর্তৃক উল্লিখিত মানচিত্র ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে, পশ্চিমাংশে চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা বলিয়া ভারত যাহা দাবি করেন, তাহার কোনো ভিত্তি নাই; কিন্তু চীন যে চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখার সপক্ষে, তাহা যথার্থই সুপ্রতিষ্ঠিত।

(২) মধ্যাংশ সম্বন্ধে। চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা লইয়া দুই পক্ষের ধারণার মধ্যে পার্থক্যের দরুন এখানে বিতর্কমূলক এলাকাগুলি হইল ; চুভা, চুখে, শিপ্‌কি গিরিপথ, সাং, সুংশা, পুলিং-সুমদো, উযে, সাংচা ও লাপ্‌থাল; এইগুলি চিরকাল চীনা ভূখণ্ড। ব্রিটেন কর্তৃক আরও আগে আক্রান্ত ও অধিকৃত সাং ও সুংশা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত এলাকায় ভারতীয় দখল বা অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়াছে ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর।

গত কয়েক শতাব্দীতে এই স্থানগুলি সংক্রান্ত জমি বিলির নথিপত্র ও জমির দলিল এখনও অবধি তিব্বতী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত আছে। যেমন, ১৮শ শতকে ৭ম দলাই লামা কর্তৃক প্রচারিত হুকুমনামায় উযে সুনির্দিষ্টভাবেই তিব্বতের দাবা জং-এর আঞ্চলিক সীমানার অভ্যন্তরস্থ বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার, তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বরাবর এই এলাকায় কর আদায় করিয়া আসিতেছেন। এবং ইহার কোনো কোনো স্থানের লোক-গণনা ও কর-সংক্রান্ত কাগজপত্র বর্তমান সময় পর্যন্তও বেশ ভালভাবে সংরক্ষিত আছে।

এই সকল স্থানের দীর্ঘায়ুদের মধ্যে প্রায় সকলেই চীনের তিব্বতী জাতীয়। বসবাসের স্থানগুলিতে বৈদেশিক দখল সত্ত্বেও তাঁহারা মাতৃভূমি হইতে বিছিন্ন হইতে চাহেন নাই। যেমন, সাং ও সুংশা ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত হইবার পরও স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের চীনা নাগরিক বলিয়াই মনে করিতেন এবং একাধিক ক্ষেত্রে তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বিবৃতিতে তাঁহারা চীনের তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তির দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় উপ ধারায় নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে তিব্বতের আরি জিলায় বাণিজ্যের বাজার হিসাবে চীন সরকার যে দশটি স্থান খুলিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার একটি হইল পুলিং-সুমদো; এবং উপরে লিখিত স্থানগুলির মধ্যে রহিয়াছে এই পুলিং-সুমদো, তাহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলাপ-আলোচনার প্রথম বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও ভারতীয়

রাষ্ট্রদূত মিঃ এন. রাঘবনের অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য নয়টি বাজারের সঙ্গে এই স্থানটি খোলা হইয়াছিল। কিন্তু, ১৯৫৪ সালের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার অল্পকাল পরেই পুলিং-সুমদো ভারত কর্তৃক অধিকৃত হয়।

ভারত সরকার দাবি করেন যে, উপরে-লিখিত স্থানসমূহে তাঁহারা বরাবর এক্তিয়ার খাটাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে সংযোজিত মন্তব্য-লিপিতে সাং ও সুংশা সম্বন্ধে অত্যন্ত কষ্টকল্পিত কয়েকটি যুক্তি ছাড়া, অন্যান্য সাতটি স্থানে বরাবর এক্তিয়ার খাটাইবার প্রমাণস্বরূপ কোনই সুনির্দিষ্ট তথ্য নাই।

ভারত সরকার যে জলবিভাজিকার নীতি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা এখানেও প্রযোজ্য নহে, কেননা, প্রত্যেক পক্ষ যথার্থভাবে যে এক্তিয়ার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ জলবিভাজিকা অনুযায়ী নহে।

দুই পক্ষ যে-সকল মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা মানিয়া চলিয়াছেন চীনই, ভারত নহে। অতীতের চীনা মানচিত্রগুলিতে সীমান্তের এই অংশ যেকানে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কয়েক খণ্ড চীনা ভূমি চীনা সীমান্তের বাহিরে পড়িলেও, ঐ সকল মানচিত্রে মোটের উপর সঠিক চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখাই প্রতিফলিত হইয়াছে। অপরপক্ষে, ১৯৫০ সাল অবধিও সরকারি ভারতীয় মানচিত্রগুলিতে এই এলাকার কোনো সীমারেখা টানা হয় নাই; "সীমান্ত অনির্দিষ্ট" এই কথা দুইটি শুধু চিহ্নিত ছিল।

(৩) পূর্বাংশ সম্বন্ধে। তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখা এবং হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে চীনা মানচিত্র অনুযায়ী সীমারেখার অন্তর্বর্তী এলাকাটি বরাবরই চীনের ছিল এবং সম্প্রতিও চীনা এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। প্রচুর তথ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

মনিউল, লোউল ও নিম্ন মাউল লইয়া এই এলাকাটিতে চীনের তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকার এক্তিয়ার খাটাইতে আরম্ভ করেন সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই। দৃষ্টান্ত হিসাবে মনিউল এলাকাটির কথা ধরা যাউক। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিব্বতের ঐক্যসাধনের সময় পঞ্চম দলাই লামা মনিউল এলাকায় শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিজ শিষ্য মেরা লামা এবং অষ্টাদশ শতকের আরম্ভের আগেই তিব্বত অঞ্চলেব স্থানীয় সরকার সমগ্র মনিউলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এলাকাটিকে ক্রমে ৩২টি "সো"তে (কয়েকটির নাম "দিন্") বিভক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র এলাকাটির বিষয়াবলী পরিচালনার জন্য মনিউলের রাজধানী তাবাং-এ "তাবাং শিদ্‌রেল" নামে পরিচিত একটি প্রশাসনিক কমিটি এবং "তাবাং দ্রেল" নামে পরিচিত উচ্চতর পর্যায়ের একটি অস্থায়ী প্রশাসনিক সম্মেলন গঠিত হইয়াছিল। তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকার সব সময়ই মনিউলে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক সংস্থাগুলির কর্মকর্তা নিয়োগ করিতেন, কর আদায় করিতেন (বছরে দুই বার করিয়া প্রধানত শস্য-কর) এবং এলাকাটির সমস্ত অংশে আইনগত কর্তৃত্ব খাটাইতেন। অতীতে তিব্বতে অনুষ্ঠিত যাবতীয় লোক-গণনায় মনিউল অন্তর্ভুক্ত হইত; মনিউলকে কোনো ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা হইত না। স্থানীয় অধিবাসী মন্‌বাদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তিব্বতীদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত; তাহারা

লামাধর্মে বিশ্বাসী, তাহারা তিব্বতী ভাষায় কথা বলিতে পারে এবং তাহারা তিব্বতী মুদ্রা ব্যবহার করিত। ৬ষ্ঠ দলাই লামা সানিউন গিয়াল্‌ৎসো এই মনিউল এলাকারই মানুষ; একের পর এক তিব্বত অঞ্চলের রাজশক্তি যে-সব হুকুমনামা দিয়া আসিয়াছেন, ৬ষ্ঠ দলাই লামার বংশ পুরুষাণুক্রমে সেই হুকুমনামার গ্রহীতা হইয়াছেন।

অধিকন্তু, এখানে বলা দরকার যে, তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখাটি সংজ্ঞাবদ্ধ ও প্রকাশিত হইবার পরও তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকার এই এলাকায় ব্যাপকভাবে ও দীর্ঘকাল যাবৎ এক্তিয়ার খাটাইয়া যাইতেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনিউলে তিব্বতী প্রশাসনিক সংস্থাগুলি ১৯৫১ সাল অবধি প্রায় ঠিকই রাখা হইয়াছিল। লোউলে ও নিম্ন সাউলে ১৯৪৬ সাল অবধি "সো" ও "দিন্" প্রশাসনিক সংস্থাগুলি বেশ ব্যাপকভাবেই বজায় রাখা হইয়াছিল এবং সেখানকার মানুষ লাসাস্থ কর্তৃপক্ষকে কর দিয়া চলিত এবং তাঁহাদের "কোর্‌ভী" দিত।

অতএব, "তিব্বতী কর্তৃপক্ষ এই এলাকায় কখনও এক্তিয়ার খাটান নাই" স্থানীয় "উপজাতিগুলি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনোপ্রকার তিব্বতী প্রভাবে সামান্যতম মাত্রায়ও প্রভাবিত হয় নাই" ইত্যাদি, ইত্যাদি যে-সকল অভিযোগমূলক বিবৃতি ভারত সরকার দেন, সেগুলি অবিশ্বাস্য।

ভারত সরকার বরাবর এই এলাকায় এক্তিয়ার খাটাইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিজের কথাই হইল এই যে, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই এলাকায় "গিয়াছে ক্রমে ক্রমে"; মোটামুটি ১৯১৪ সাল অবধি সাধারণভাবে উপজাতিগুলিকে "নিজেদের দেখাশোনার ভার কমবেশি তাহাদের নিজেদেরই উপর" ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসারেরা শুধু "এই সকল এলাকায় যাইতেন"। এই এলাকায় যে-সকল ব্রিটিশ অফিসার গিয়াছেন, তাঁহারাই বা কি বলেন? ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ক্যাপ্টেন বেইলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখাটি নির্ধারিত করিবার উদ্দেশ্যে বে-আইনি অনুসন্ধান ও জরিপকার্য চালাইবার জন্য ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার বিশেষভাবে ইঁহাকে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার বই "নো পাসপোর্ট টু টিবেট"-এ তৎকালে মনিউল এলাকায় তিব্বতীয় স্থানীয় সরকারের এক্তিয়ারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন; এই বছর (১৯৫৯) ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে তিনি আবার বলিয়াছেন, "আমরা তায়াং-এ (অর্থাৎ মনিউলের রাজধানীতে) পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেখানে ষোল-আনা তিব্বতী প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে"। তৎকালে সুষণসিরিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার, যিনি এই এলাকায় অনুসন্ধান কার্যের জন্য ভারতের আসামের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন ১৯৪৪ সালে, অর্থাৎ তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখা সংজ্ঞাবদ্ধ হইবার ত্রিশ বছর পরে, সেই ক্রিস্টফ্ ফন্ ফুরের-হাইমেন্‌ডর্ফ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত "হিমালয়্যান বার্‌বারি" বইয়ে দেখাইয়াছেন যে, এই এলাকার সীমান্ত সংজ্ঞাবদ্ধ ছিল না, তাহার কোনো জরিপ হয় নাই এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। এইভাবে দেখা যায়, দশকের পর দশক

এবং শত শত বছর যাবৎ এলাকাটি ভারতেরই এবং বর্তমান সীমান্ত বরাবর ছিল ঐতিহাসিক সীমান্ত, ইত্যাদি, ইত্যাদি কথা কত অচল।

ভারত সরকার বলেন যে, ১৮৪৪ হইতে ১৮৮৮ সালের মধ্যে ব্রিটিশ কোনো কোনো স্থায়ীয় উপজাতির সঙ্গে কতকগুলি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই চুক্তিগুলি ভারতীয় এক্তিয়ারের প্রমাণ। কিন্তু মন্‌বা-দের সঙ্গে ১৮৫৩ সালের যে চুক্তির কথা প্রধানমন্ত্রী নেহরু দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মনবা-দের এই বিবৃতি দিয়া আরম্ভ হইয়াছে : "...উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এজেন্ট গভর্নর-জেনারেলের নিকট দাবা রাজাসের বন্ধুত্বসূচক পত্র লইয়া যাইবার জন্য আমরা প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইয়া এবং ভারত সরকার ও আমাদের লাসা সরকারের মধ্যে পূর্বে যে-সম্পর্ক ছিল তাহা...পুনঃস্থাপিত হউক...এই কামনা করিয়া...।" এই অংশটি হইতে সঠিকবাবে ও তর্কাতীতভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মন্‌বা-রা তিব্বতের লোক—ভারতের লোক নহেন এবং তাঁহারা তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতির ভিত্তিতে ভারত সরকার তাঁহাদের সঙ্গে চুক্তিটি সম্পাদন করিয়াছিলেন। এখানে যে-দাবা রাজাস্‌-এর কথা বলা হইল, তিনি ছিলেন তিব্বত অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের রাজপ্রতিনিধি। আবোর ও আকা-দের সঙ্গে যে চুক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলির ভাষা হইতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঐ সকল উপজাতীয় এলাকা ব্রিটিশ ভূখণ্ড ছিল না। কোনো কোনো চুক্তিতে এমন কথাও স্পষ্ট বিবৃত আছে যে, ব্রিটিশ ভূখণ্ড "পাহাড়ের পাদদেশে (অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশ) পর্যন্ত প্রসারিত"।

যথাক্রমে চীনা ও ভারতীয় পক্ষ হইতে উপস্থাপিত উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে দেখা যায় যে, এই এলাকাটি বরাবরই চীনেরই ছিল—ব্রিটেনের কিংবা ভারতের নহে।

দুই দেশে প্রকাশিত প্রামাণ্য মানচিত্রগুলি হইতেও এই সিদ্ধান্তটি জোরের সহিত অনুমোদিত হয়। চীনে প্রকাশিত মানচিত্রসমূহে এই এলাকাটিকে সচরাচর চীনা ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ সত্যকার চিরাচরিত সীমান্ত বরাবর উহাতে সীমান্তটি চিহ্নিত করা হয়। এখন চীন সরকারের হস্তগত তথ্যাদি হইতে দেখা যায় যে, সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি মানচিত্রে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৩৮ সালের সংস্করণের মানচিত্রেও সীমান্ত চিহ্নিত করিবার ঐ একই ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইত। ১৯৩৮ সালের পরে এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া সীমান্ত চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখা অনুসারে সীমান্ত চিহ্নিত করিতেন, কিন্তু তখনও অচিহ্নিত সীমান্তের চিহ্ন ব্যবহার করা হইত। আবার পরিবর্তন ঘটাইয়া সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া ১৯৫৪ সাল হইতে অচিহ্নিত সীমান্তটিকে চিহ্নিতসীমান্তে পরিণত করেন। পর পর এ সকল পরিবর্তনের দ্বারা সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া এই এলাকাটিকে চীনা ভূখণ্ড হিসাবে স্বীকার করিবার মূল মনোভাব হইতে সরিয়া আসিয়া এলাকাটিকে ভারতের চিরকালের আইনসম্মত ভূখণ্ড বলিয়া দাবি করিবার মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় মানচিত্রগুলির সীমান্ত চিহ্নিত করিবার বর্তমান ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত হয় নাই। উপরে বলা হইয়াছে—ব্রিটেনের রাজার মানচিত্র-রচয়িতা জন বার্থোলোমিউ-এর দ্বারা সংকলিত ও ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'অ্যাটলাসে'ও ইহাকে বিতর্কমূলক এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে; আবার, প্রধানমন্ত্রী

নেহরুর "ডিস্‌কভারি অব্‌ ইণ্ডিয়া" নামক বইয়ে সংযোজিত "ভারত ১৯৪৫" মানচিত্রেও সীমান্ত চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থাটি চীনা মানচিত্রের মতোই।

'চায়না ইনল্যান্ড মিশন' নামে একটি ধর্মীয় ব্রিটিশ সংগঠন ১৯০৬ সালে লণ্ডনে চীন সাম্রাজ্যের যে-ভূচিত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছিল এবং যে-বিষয়টি ভারত সরকার উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল প্রামাণ্য তথ্যের বিচারে তাহা স্পষ্টতই গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা সম্বন্ধে চীন সরকারের মতামত বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব সমস্ত অংশেই উহা প্রভূত তথ্যাদি দ্বারা অনুমোদিত। অপরপক্ষে, ভারতীয় মানচিত্রে সীমান্তের মধ্যাংশটির প্রায় সর্বাংশই বাস্তবের সহিত মিল আছে এবং উহা ছাড়া ভারতীয় মানচিত্রে চিহ্নিত সীমারেখা আদৌ চিরাচরিত প্রচলিত সীমারেখা অনুযায়ী নহে। এই (ভারতীয় মানচিত্রে—অনুবাদক) সীমারেখার পূর্ব ও পশ্চিমাংশ যে আধুনিক ইতিহাসের ব্রিটিশ আক্রমণ ও সম্প্রসারণ কর্মনীতিরই ফল, বিশেষভাবে এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রকট হইয়া যায়।

আধুনিক ইতিহাসে ব্রিটিশ আক্রমণ ও সম্প্রসারণের কর্মনীতি লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হইবার কথা নহে, কেননা, খাস ভারতেরই ইতিহাসে, ভারতের সন্নিহিত এবং একদা ব্রিটিশ-ভারতের অঙ্গ বা উহার অধীনস্থ দেশগুলির ইতিহাসে, চীনের ইতিহাসে এবং বিশেষত, ভারতের সন্নিহিত চীনের তিব্বত অঞ্চলের ইতিহাসে, এইসবের মধ্যেই (ব্রিটিশ) এই কর্মনীতির সাক্ষ্য রহিয়াছে। তিব্বতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণে অবতীর্ণ হইয়া এবং তিব্বতকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করাইবার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া ব্রিটেন সীমান্ত অংশকে ঠোকরাইতে থাকে—মানচিত্রেও এরূপ করিতে থাকে এবং কাজেও এরূপ করিতে থাকে। ইহার ফলে যে সীমারেখাটি সৃষ্টি হয়, তাহাই ভারত পরে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এবং বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় মানচিত্রে তাই দেখান হইয়াছে। অবশ্য, মহান ভারতীয় জনগণ শান্তিকে মহামূল্যবান সামগ্রী বলিয়া গণ্য করেন; ভারতকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়া ব্রিটেন যত আক্রমণ চালাইয়াছে তাহার জন্য ভারতীয় জনগণকে কোনক্রমেই দায়ি করা চলে না। তবে, তিব্বতের বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্য দিয়া ব্রিটেন বে-আইনিভাবে যে সীমারেখা সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার মধ্যে এমন সব এলাকাও অন্তর্ভুক্ত যেখানে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয় নাই। সেই সীমারেখাই যে ভারত সরকার দাবি করিতেছেন এবং চীন সরকার বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত চিরাচরিত প্রচলিত সীমান্ত দেখাইয়া দিলে, তাহাকে যে ভারত সরকার বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর চীনের দাবি বলিয়া বিকৃতভাবে অভিহিত করিতেছেন—ইহা বিস্ময়কর। চীন সরকারের অবস্থায় থাকিলে ভারত সরকারেরই বা কি মনে হইত? (ভারত সরকারের) এই উক্তি বজায় রাখা হইলে, তাহা হইতে অনিবার্য সিদ্ধান্ত ইহাই করিতে হয় যে, ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদীরাই ছিল অতিশয় ন্যায্য-মনোভাবাপন্ন, আর উৎপীড়িত চীনই ছিল নগ্ন-উচ্চাভিলাষপূর্ণ; এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, গত এক শত বৎসর ও তাহার বেশি কাল ধরিয়া পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই চিরাচরিত চীন-ভারত সীমান্তটিকে নিরন্তর সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন আর ব্রিটিশ ভূখণ্ডের উপর নিরবচ্ছিন্ন অনধিকার প্রবেশকার্য করিয়া যাইতেছিল দুর্বল চীন। চীন সরকার মনে করেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহই স্বীকার করিবেন না।

প্রশ্ন ৩

চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার উপযুক্ত পন্থা কি?

চীন-ভারত সীমান্ত কখনও বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হয় নাই এবং সীমান্ত সংক্রান্ত প্রশ্নে দুই পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে—এই মর্মে উপরে যেসকল তথ্য উল্লিখিত হইল, তাহার ভিত্তিতে চীন সরকার বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান যথার্থ অবস্থা বিবেচনা করিয়া, পঞ্চশীল অনুসারে ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চীনা ও ভারতীয় পক্ষের দিক হইতে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত-প্রশ্নের সামগ্রিক সমাধানের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত; যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিনের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে দুই পক্ষ সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখুন এবং বলপ্রয়োগ তো নয়ই, একতরফা ব্যবস্থা দ্বারাও কোনো পক্ষ যেন ইহা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা না করেন; কোনো কোনো বিরোধ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আংশিক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সীমান্ত নির্ধারিত হয় নাই এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নটির সামগ্রিক মীমাংসার চেষ্টাই করিতে হইবে—এই মর্মে চীন সরকারের যে-বক্তব্য, তাহার সঙ্গে ভারত সরকারের মতানৈক্য রহিয়াছে; ভারত সরকার শুধু এইটুকুই স্বীকার করেন যে, কিছু কিছু গৌণ ও আংশিক মীমাংসা করা যাইতে পারে—তবু দুই পক্ষ যেন সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখেন, বলপ্রয়োগ এড়াইয়া চলেন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন—তাহাতে ভারত সরকার রাজি। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, যদিও দুই পক্ষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে, তবু সীমান্তে শান্ত অবস্থার সৃষ্টি এবং দুই দেশের বন্ধুত্বকে নিশ্চিত করা যাইত।

চীন সরকার যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত ঘটিল; ভারত সরকার বরাবর জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, সীমান্ত নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া চীন সরকার পূর্বে মত দিয়াছিলেন এবং সীমান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের দাবি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মাত্র সম্প্রতি চীন সরকার এই মনোভাব পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার সীমান্তের স্থিতাবস্থা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই ঠিক নয়। বাস্তব কাজের দিক দিয়া তাঁহারা স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছেন বারবার, এমনকি বলপ্রয়োগেরও শরণ লইয়াছেন—এইভাবে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে, ভারত সরকার অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত কিছুর জন্য চীন সরকারকে দায়ি করিতে হইবে এবং তাঁহারা বলিয়াছেন যে, চীনের "আক্রমণ" ও "সম্প্রসারণের" অভিলাষ আছে। ভারত সরকারের উপরে-উল্লিখিত মনোভাবের ফলে সীমান্তের প্রশ্নটি আরও বেশি কঠিন ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, চীন সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্ট করিয়া তোলা প্রয়োজন মনে করেন :

(১) সীমান্ত নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া চীন সরকার কখনও স্বীকার করিয়াছেন কিনা

এবং সীমান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের দাবি গ্রহণ করিয়া পরে সেই মনোভাব পরিবর্তন করিয়াছেন কিনা।

১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ভারত সরকার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই চুক্তিতে ভারত ও তিব্বত অঞ্চলের মধ্যকার সমস্ত অমীমাংসিত বিষয়ের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে; অতএব, সীমান্তের প্রশ্নটি মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বাস্তবিক, ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তিটি হইল চীনের তিব্বত অঞ্চল ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত চুক্তি; সীমান্তের প্রশ্নের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই এবং চুক্তিটির কোনো ধারায় সীমান্ত সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। এখানে স্মরণ করা যায় যে, নূতন ভিত্তিতে ভারত ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রশ্ন লইয়াই দুই দেশ তখন সবচেয়ে বেশি উদ্গ্রীব ছিলেন এবং উহার মীমাংসা তখন জরুরি ছিল। আলাপ-আলোচনাকালে কোনো পক্ষ সীমান্তের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিবার কথা বলেন নাই; তখনকার সর্বাধিক জরুরি প্রশ্নটির মীমাংসা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহারই জন্য এরূপ হইয়াছিল। বিষয়টি উভয়পক্ষের নিকট স্পষ্ট ছিল। আলাপ-আলোচনার একেবারে গোড়াতেই প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ভারতীয় সরকারি প্রতিনিধিদলের নিকট ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, "দুই দেশের মধ্যে যেসকল অমীমাংসিত প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার পরিপক্ক অবস্থায় আসিয়াছে, সেইগুলির মীমাংসা করাই" আলাপ-আলোচনার কাজ। পরে, ১৯৫৪ সালের ৮ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে দুই পক্ষ যুক্তভাবে স্থির করিয়াছিলেন যে, দুই দেশের মধ্যে যেসকল অমীমাংসিত প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার অবস্থায় আসিয়াছে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল অনুসারে সেইগুলির মীমাংসা করাই আলাপ-আলোচনার কাজ। আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে সীমান্তের প্রশ্নটি উত্থাপন করা হইবে না, তাহাও ঐ বছরই ২৩শে এপ্রিল চীনের প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন। চীনা পক্ষের এই বক্তব্যে ভারতীয় প্রতিনিধি সম্মত হইয়াছিলেন। অতএব, সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে, ভারত সরকারের যে ধারণা চীন সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন কিংবা সীমান্তের প্রশ্নটি লইয়া আলোচনার জন্য চীন সরকার পরে উত্থাপন করিবেন না—এমন কিছু দেখাইবার মতো কোনো তথ্যই নাই।

১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে পিকিং-এ প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে কতাবার্তার বিষয়ও উল্লেখ করিয়া ভারত সরকার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীনা মানচিত্র সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের মন্তব্যের অর্থ এই যে, চীন সরকার ভারতীয় মানচিত্র অনুসারেই নিজ মানচিত্রকে সংশোধন করিবেন, অর্থাৎ সীমান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের দাবি চীন সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঘটনা হইল এই যে, চীনা মানচিত্রে চীন-ভারত সীমান্ত যেভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তখন আপত্তি জানাইয়াছিলেন; কাজেই, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পুরানো মানচিত্র অনুসারেই চীনা মানচিত্রে এই সীমান্ত চিহ্নিত হয়—জরিপ না করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আপনা আপনি এই সীমান্ত অঙ্কন পরিবর্তন করা চীন সরকারের পক্ষে উচিত হইবে না।

ভারতের সঙ্গে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও কোনো কোনো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চীনের সীমান্তটি যে অনির্ধারিত রহিয়াছে, এই কথাটি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তখন বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অবশ্য বলিয়াছিলেন, তিনি মনে করেন যে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত লইয়া কোনো প্রশ্ন নাই। এই কথোপকথন হইতে দেখা যায় যে, সীমান্ত সম্বন্ধে দুই পক্ষের মধ্যে স্পষ্টই একটা মতপার্থক্য ছিল এবং মানচিত্রের যেকোনো একতরফা পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই স্পষ্টই মতানৈক্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তখন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ রেখার প্রতি চীন সরকারের স্বীকৃতি সূচিত হয়—এইরূপ মনে করিয়াই, ১৯৫৬ সালের শেষভাগে প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে ভারতে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহার উল্লেখও ভারত সরকার করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখার বিষয় উল্লেখ করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, উহা বে-আইনি এবং চীন সরকার কখনও উহা স্বীকার করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা সত্ত্বেও, সীমান্তে শান্ত-অবস্থা নিশ্চিত করিবার জন্য এবং দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া চীনা সামরিক ও প্রশাসনিক লোকলস্কর সর্বপ্রকারে ঐ রেখা অতিক্রম করা হইতে বিরত থাকিবেন এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সীমান্তের পূর্বাংশ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার উপযুক্ত পন্থা পরে পাওয়া যাইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের এই কথাটিকে ঐ রেখার সম্বন্ধে চীন সরকারের স্বীকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা কোনক্রমেই যায় না।

এইভাবে দেখা যায় যে, সীমান্তটি যে নির্ধারিত হয় নাই এবং দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহা মীমাংসা করিবার কাজটি যে এখনও বাকি রহিয়াছে, এই মর্মে চীন সরকার সর্বদাই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। চীন সরকার গোড়ার মনোভাব পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকার যে-কথা বলিতে চাহেন, তাহার সহিত তথ্যের মিল নাই।

(২) সীমান্তে স্থিতাবস্থাটিকে চীন সরকার সযত্নে মানিয়া চলেন কিনা।

চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নের সামগ্রিক সমাধান যতদিন না হইতেছে, ততদিন সীমান্তের স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার নীতি উভয়পক্ষেরই দ্বারা স্বীকৃত।

চীন সরকার নিষ্ঠার সহিত এই নীতি মানিয়া আসিয়াছেন। মুক্তির পর হইতে গত দশ বৎসর যাবৎ চীনা সামরিক ও প্রশাসনিক লোকলস্করের উপর এই নির্দেশ রহিয়াছে যে, যে-সকল এলাকা বরাবর চীনা এক্তিয়ারভুক্ত তাহা ছাড়াইয়া যেন কেহ না যান, এমনকি, পূর্বাংশে তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখাও যেন তাঁহারা পার না হন।

সীমান্তে স্থিতাবস্থা সম্বন্ধে ভারত সরকারের ব্যাখ্যা কিন্তু দুই পক্ষের এক্তিয়ারের যথার্থ পরিসরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে; ভারতের এক্তিয়ার যেখানে কখনও পৌঁছায় নাই, এমন সব বৃহৎ বৃহৎ এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিয়া রচিত ভারতীয় মানচিত্রে একতরফাভাবে নির্দিষ্ট যে-সীমারেখা দেখান হয়, তাহাই ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তি। এইরূপে, সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর বারবার সীমান্তের স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন করিয়া, পারিগাস্, চুভা, চুযে, পিশ্‌কি গিরিপথ,

পুলিং-সুমদো, সাংচা ও লাপ্‌থালে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ধাপে ধাপে দখলের পরিসর সম্প্রসারিত করিয়াছে এবং আকসাই চিন্, পাংগং হ্রদ, কংকা গিরিপথ ও উষে-তে অনধিকার প্রবেশ করেন। কিন্তু ভারত সরকার এই সমস্ত কাজকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হিসাবে অভিহিত করেন। এই বছর (১৯৫৯ সাল) মার্চ মাসে তিব্বতে বিদ্রোহ ঘটিবার পর, (সীমান্তের) পূর্বাংশে সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখাও অতিক্রম করে, একবার তাহারা লোংজু ও তামাদেন দখল করে এবং এখনও খিঞ্জেমানে দখল করিয়া রহিয়াছে; ঐ এলাকাগুলি সবই ঐ রেখার উত্তরে অবস্থিত।

১৯৫৪ সালের চুক্তিতে নির্দিষ্ট চীনা বাজারগুলির একটি হইল পুলিং-সুমদো এবং সেই স্থানটি ভারতীয় পক্ষ দখল করিয়াছেন; ভারত নিজেই চীনা ভূখণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন তামাদেনকে—সেই স্থানটিকে ভারতীয় পক্ষ একবার দখল করিয়াছিলেন; তথাপি সীমান্তে স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন করিবার কথা ভারত সরকার বরাবর অস্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু, নিজস্ব মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমারেখার ভিত্তিতে ভারত সরকার সীমান্তে স্থিতাবস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলিয়াছেন চীনের বিরুদ্ধে। ইহার সঙ্গে চীন সরকার একমত হইতে পারেন না।

(৩) চীন সরকার আন্তরিকতার সহিত বলপ্রয়োগ পরিহার করিয়াছেন কিনা।

কোনো পক্ষই ইচ্ছা করেন নাই, এমন দুইটি সশস্ত্র সংঘর্ষ হালে ঘটিয়াছে মিগিতুন এলাকায় ও কংকা গিরিপথ এলাকায়। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ঘটনা দুইটির জন্য চীনকে দায়ি করা যায় না। লোংজুতে আক্রমণকারী ও দখলদার সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর আরও অগ্রসর হইয়া মিগিতুনের সন্নিহিত দক্ষিণ এলাকায় একটি টহলদার দলের উপর আক্রমণ চালাইবার ফলে মিগিতুন এলাকায় ২৫শে আগস্ট তারিখের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। ভারত বে-আইনিভাবে লোংজুতে যে-ফাঁড়ি বসাইয়াছিল, তাহার উপর সশস্ত্র চীনা লোকলস্কর কখনও আক্রমণ চালায় নাই; পক্ষান্তরে, লোংজু ফাঁড়ি হইতে পরদিন আরও ব্যাপকভাবে গুলি চালাইয়া ঐ আক্রমণ চালাইয়াছিল ভারতীয় লোকলস্কর, কিন্তু মিগিতুনে মোতায়েন চীনা সৈনিকেরা কখনও পাল্টা গুলি চালায় নাই। অধিকতর শক্তিবলে চীনা সৈনিকেরা লোংজু ফাঁড়ি হইতে ভারতীয় লোকলস্করদের বিতাড়িত করে বলিয়া যে অভিযোগ, তাহা সত্য নহে। সশস্ত্র চীনা লোকলস্কর লোংজুতে প্রবেশ করে মাত্র ১লা সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ যেদিন সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর লোংজু হইতে অপসৃত হয় সেই ২৭শে আগস্ট হইতে গুনিলে তার ৫ দিন পরে।

২১শে অক্টোবরের কংকা গিরিপথের ঘটনাটির ব্যাপার তো আরও স্পষ্ট। তিন জন সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্কর চীনা ভূখণ্ডের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিবার ফলে আটক হইবার পরদিন ৬০ জনেরও বেশি ভারতীয় লোকলস্কর হাল্কা ও ভারী মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চীনা ভূখণ্ডের আরও অভ্যন্তরভাগে অনধিকার প্রবেশ করিয়া, শুধু হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত মাত্র ১৪ জন চীনা টহলদারের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ভারতীয় দলটি গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং পরেও, গুলি না চালাইবার জন্য চীনা টহলদার-দলটি বারবার হুঁশিয়ারি দিয়াছিল। চীনা স্কোয়াডটির সহকারী নেতা উ চিং কুণ ভারতীয় লোকলস্করের উদ্দেশে দুই হাত নাড়িয়া গুলি না চালাইবার জন্য আহ্বান

জানাইয়াছিলেন, কিন্তু এই শ্রদ্ধেয় কমরেডই সর্বপ্রথম গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। ইহার পরই চীনা টহলদার-দলটি পাল্টা গুলি চালাইতে বাধ্য হয়।

চীন যে বলপ্রয়োগ করিতে বরাবর অস্বীকার করিয়াছে, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয় :

(ক) ১৯৫৫ সালে যখন চীনা ভূখণ্ড উযে-তে দুই পক্ষের সশস্ত্র শক্তি মুখোমুখি হইবার পরিস্থিতি প্রথম দেখা দিল, তখন চীনা পক্ষ উদ্যোগী হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা যতদিন না হইতেছে ততদিন কোনো পক্ষ যেন উযে-তে সৈন্য মোতায়েন না করেন।

(খ) পারিগাস, চুভা, চুযে, শিপ্‌কি গিরিপথ, সাং, সুংশা, পুলিং-সুমদো, সাংচা, লাপ্‌থাল ও খিঞ্জেমানে—এই যে চীনা ভূখণ্ডগুলি ভারতীয় পক্ষ দখল করিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে সশস্ত্র ভারতীয় লোকলস্করকে চীন সরকার কখনও অস্ত্রবলে অপসৃত হইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন নাই। যে তামাদেনকে ভারত সরকার নিজেই চীনা ভূখণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন, এমনকি সেই এলাকার ক্ষেত্রেও, ভারতীয় ফৌজ স্বেচ্ছায় সরিয়া যাইবে বলিয়া চীন সরকার ধৈর্যভরে অপেক্ষা করিয়াছেন—বলপ্রয়োগের শরণ লন নাই।

(গ) চীনা সীমান্ত-ফাঁড়িগুলির রক্ষী সৈন্যদলের অবস্থানের এলাকায় ভারতীয় লোকলস্কর অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে চীনা ভূখণ্ড ছাড়িয়া যাইবার জন্য চীনা সীমান্তরক্ষীরা বলিয়াছে সর্বাগ্রে এবং ইহার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এবং এইরূপ পরামর্শে তাহারা কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করিলে তবেই তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে অস্ত্রসমেত তাহাদিগকে চীনা ভূখণ্ড হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) এই মর্মে সমস্ত চীনা সীমান্তরক্ষীর উপর আদেশ আছে যে, আগে সশস্ত্র আক্রমণ না হইলে অস্ত্রপ্রয়োগে সর্বতোভাবে বিরত থাকিতে হইবে।

(ঙ) কংকা গিরিপথের দুঃখজনক ঘটনার পর, সমগ্র সীমান্তে টহল বন্ধ করিবার জন্য চীন-ভারত সীমান্তরক্ষী সৈনিকদের উপর চীন সরকার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(চ) সম্পূর্ণ ও কার্যকরভাবে সীমান্ত-সংঘর্ষ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, সীমান্তে উভয়পক্ষের সশস্ত্র লোকলস্কর ২০ কিলোমিটার করিয়া কিংবা উপযুক্ত হইবে এরূপ কোনো দূরত্বে অপসৃত হউক, এই বলিয়া চীন সরকার সম্প্রতি বারবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

উল্লিখিত তথ্যগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সীমান্তে শান্ত অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য এবং বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই চীন সরকার অবলম্বন করিয়াছেন।

কংকা গিরিপথে ঘটনার পর, টহল বন্ধ করিবার জন্য ভারত সরকারও তাঁহাদের সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং আত্মরক্ষার একেবারে শেষ অবলম্বন হিসাবে ছাড়া কোনো পক্ষ কোনোক্রমে বলপ্রয়োগের শরণ লইবেন না এই ইঙ্গিত ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট দিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহে স্বাগত করিবার মত প্রস্তাব। অবশ্য, এই দুইটি সংঘর্ষ ঘটিবার পূর্বে এই বছর (১৯৫৯) ১১ই আগস্ট তারিখের মন্তব্য-

লিপিতে ভারত সরকার চীনা সরকারকে এই মর্মে জানাইয়াছিলেন যে, "অনধিকার প্রবেশকারীদের ঠেকাইবার জন্য এবং প্রদত্ত হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত না করিলে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পরিমাণ বলপ্রয়োগ করিবার জন্য" ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের উপর নির্দেশ আছে। ভারত সরকারের ঐ মন্তব্য-লিপিতে আরও বলা হইয়াছিল যে, "কোনো চীনা সৈন্য এখনও ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে থাকিলে, তাহাদিগকে অবিলম্বে অপসারণ করিতে হইবে, নহিলে উহা হইতে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, অথচ যে সংঘর্ষ পরিহার করা সম্ভব"। ১৯৫৯ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক চীন সরকারের নিকট প্রেরিত মন্তব্য-লিপি হইতে দেখা যায় যে, প্রথম সংঘর্ষ ঘটিবার পরও, "প্রয়োজন হইলে অনধিকার প্রবেশকারীদের উপর বলপ্রয়োগ" করিবার নির্দেশ দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের উপর। একথা বলা দরকার যে, যেহেতু সীমান্ত সম্বন্ধে দুই দেশের ধারণার মধ্যেই পার্থক্য রহিয়াছে, মানচিত্রের মধ্যেই পার্থক্য রহিয়াছে এবং যেহেতু বরাবর চীনা এক্তিয়ারভুক্ত বৃহৎ বৃহৎ চীনা ভূখণ্ডকে ভারতীয় ভূখণ্ড বলিয়া ভারত সরকার মনে করেন, সেইহেতু নিজেদেরই দেশের মাটিতে মোতায়েন থাকা চীনা সামরিক ও প্রশাসনিক লোকলস্করকে ভারতীয় পক্ষ যে "অনধিকার প্রবেশকারী" বলিয়া অভিহিত করিবে, তাহা তো অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে একরকম অবাধেই বলপ্রয়োগ করিতে পারিত। সীমান্তের দুঃখজনক ঘটনা দুইটির সহিত যে এইরূপ নির্দেশের কোনো সম্পর্ক নাই, এমন কথা যে বলা যায় না তাহা স্পষ্ট।

(৪) চীন "আক্রমণে" কিংবা "সম্প্রসারণে" লিপ্ত হইতে চাহে কিনা।

চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রচুর পরিমাণ চীন-বিরোধী উক্তি হইয়াছে। ঐ সকল উক্তিতে ঠাণ্ডাযুদ্ধের ভাষায় চীনকে "সাম্রাজ্যবাদ", "ভারতের উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণশীল" এবং "আক্রমণকারী" নাম দিয়া কুৎসা করা হইয়াছে। চীনের বিরুদ্ধে এইসকল বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা নিতান্তই বাস্তবতাবর্জিত এবং চীনের জনগণ ইহাতে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন না।

চীন এখন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিহাসের কোনো কোনো চীনা শাসনের মতো কিংবা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মতো চীন বিদেশে সম্প্রসারণ চাহিবে—এইরূপ একটি মন্তব্য ভারতে যে বেশ চলিতেছে, তাহা চীন সরকার লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহারা চীনের প্রতি স্পষ্টতই বৈরীভাবাপন্ন তাহারা ছাড়া, যাঁহারা এই মন্তব্য প্রচার করেন তাঁহাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্ভবত নূতন চীন সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাবের ফলেই এরূপ করেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সরকার ও ভারতের জনগণের নিকট চীনের মনোভাবটিকে আর একবার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়াই চীন সরকার মনে করেন।

চীনের জনগণ যদিও কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তবু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া চীন এখনও অত্যন্ত অনগ্রসর এবং এই অনগ্রসরতা অতিক্রম করিতে চীনের জনগণের এখনও কয়েক দশক কিংবা শতাধিক বৎসর পর্যন্ত কঠোর প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে চীন কখনও উহার প্রতিবেশী দেশগুলির পক্ষে বিপদ হইয়া উঠিবে না, ঠিক যেমন ভারত শক্তিশালী হইয়া উঠিলে—ভারতের যে-

শক্তিলাভ চীন বিশেষভাবে কামনা করে—ভারতও যে চীনের পক্ষে বিপদ হইবে তা চীন মনে করে না। চীনের জনসংখ্যা ও শিল্পের বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা চীনের প্রতিবেশীদের বিপদের কারণ হইবে বলিয়া যে-কথা বলা হয়, তাহা চীনের জনগণের সম্পূর্ণ ধারণাতীত। চীনের সমাজব্যবস্থা হইল সমাজতান্ত্রিক; এই সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মেহনতী জনগণের হাতে; সমাজতান্ত্রিক চীনের জনগণ ও সরকার অন্যান্যকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য পোষণ করে না, এমন কোনো উদ্দেশ্য তাহাদের থাকিতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। অধিকন্তু, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবশ্যলক্ষণীয় : প্রথমত, চীনের জনসংখ্যা যদিও মুক্তির পর হইতে উচ্চতর হারে বাড়িয়াছে, তবু বার্ষিক গড়পড়তা বৃদ্ধির হার শতকরা দুই ভাগ মাত্র, কিন্তু চীনে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার শতকরা ৯·৮ ভাগে উঠিয়াছে এবং বার্ষিক বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার হইয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ। ভবিষ্যতে চীনে প্রতি একর পরিমাণ মাটিতে শস্যের উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি আরও বহু পরিমাণে বাড়ানো হইবে। তাহা ছাড়াও চীনের ভূখণ্ড বিশাল; উহার অর্ধেকের বেশি জনবসতিবিরল এবং উহার উন্নয়নকার্যে প্রচুর প্রচেষ্টা প্রয়োজন হইবে। অতএব, নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্যান্য দেশের ভূখণ্ড গ্রাস করিবার আদৌ কোনো প্রয়োজনই চীনের জনগণের নাই। দ্বিতীয়ত, চীনের শিল্পক্ষেত্রে যদিও কিছু উন্নয়ন ঘটিয়াছে, তবু এই শিল্প এখনও স্বদেশের মানুষের প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে মিটাতে পারে না। চীন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ; বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজারও চীনে রহিয়াছে, চীনের শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে কাঁচামাল হস্তগত করিবারও প্রয়োজন নাই, বিদেশে যাইয়া পণ্য সস্তায় বিক্রয় করিবারও প্রয়োজন নাই। তৃতীয়ত, শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের ফলে চীনে শ্রম-শক্তির ঘাটতিই পড়িয়াছে, আধিক্য ঘটে নাই। অতএব, বিদেশে পাঠাইবার মতো কোনো অতিরিক্ত জনসংখ্যা চীনে নাই।

শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যের বিরাট লক্ষ্যগুলি সাধন করিবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশ চীনের জনগণের পক্ষে জরুরি প্রয়োজন। অতএব, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন সরকার বরাবরই শান্তির কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন এবং বড়-ছোট সকল দেশের সঙ্গে পঞ্চশীলের ভিত্তিতে বন্ধুভাবে বসবাস করিতেই চীন সরকার ইচ্ছুক। চীন ও অন্যান্য দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, বলপ্রয়োগের শরণ না লইয়া শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ন্যায্য ও যুক্তিসম্মত সমাধানের জন্য চীন সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা চীনের পক্ষে অসম্ভব, অসমীচীন ও অপ্রয়োজনীয় এবং কেবল তাহাই নহে—প্রতিবেশীরা সকলেই দ্রুত সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী হইয়া উঠুন, ইহাই বরং চীন সরকারের আন্তরিক আশা। কেননা, একমাত্র এইভাবেই আমরা সকলে একযোগে আরও কার্যকরভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও আক্রমণ রোধ করিতে পারি এবং এই এলাকায় শান্তি বজায় রাখিতে পারি; একমাত্র এইভাবেই আমরা আরও ভালভাবে পরস্পরের প্রয়োজন মিটাইতে পারি এবং গঠনকার্যে পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারি।

সীমান্তের প্রশ্নের ব্যাপারে, চীন পরদেশীয় ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও কোনোক্রমেই চাহে নাই। চীন ও তাহার বহু প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অনির্ধারিত সীমান্ত রহিয়াছে; কিন্তু

সীমান্তের বর্তমান যথার্থ অবস্থাকে একতরফা কার্য দ্বারা কোনো প্রকারে পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে চীন এই পরিস্থিতির সুযোগ কখনও গ্রহণ করেও নাই, করিবেও না কখনও। সীমান্ত নির্ধারিত হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, সীমান্তের প্রশ্নাবলী লইয়া যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোনো মনান্তর বা সংঘর্ষ না ঘটে, সেজন্য সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাসমূহ গঠন করিবার কাজে চীন প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে সদা-প্রস্তুত।

ভুটান ও সিকিম সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ না করিয়া, দেশ দুইটির সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করা ভিন্ন কোনো অভিপ্রায় চীনের নাই। চীন ও ভুটানের মধ্যকার সীমান্তের ক্ষেত্রে, তথাকথিত ম্যাকমোহন রেখার দক্ষিণস্থ অংশে দুই পক্ষের মানচিত্রে সীমান্ত চিহ্নিত করিবার ব্যাপারে শুধু কিছুটা গরমিল আছে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে বরাবর সর্বদাই শান্ত অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। চীন ও সিকিমের মধ্যে সীমান্ত দীর্ঘকাল হইল বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত রহিয়াছে; মানচিত্রগুলির মধ্যে কোনো গরমিলও নাই, কার্যক্ষেত্রে কোনো বিরোধও নাই। ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিমের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে চীন আক্রমণ চালাইতে চাহে বলিয়া যে-কথা বলা হয়, সেই কথার মতোই, ভুটানে ও সিকিমে চীনের "অনধিকার প্রবেশ করিতে" চাহিবার কথাটিও নিছক বাজে কথা।

প্রতিবেশীদের প্রতি চীন সরকারের যে মৌলিক মনোভাব তাহা দীর্ঘকাল হইল বারবার সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহা লইয়া সবিস্তারে বলিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে, দুর্ভাগ্যের কথা, সম্প্রতি—বিশেষত চীনের তিব্বত অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিদাস-মালিকদের বিদ্রোহ দমিত হইবার সময় হইতে ভারত চীনের মনোভাবটিকে বিভিন্নভাবে বিকৃত করিয়া উহার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছেন। দুই দেশের বন্ধুত্বের স্বার্থে, চীন সরকার এই বিরুদ্ধ-সমালোচনার জবাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে চাহেন না। চীন সরকার বরং ধরিয়া লইতে চাহেন যে, চীনের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভারত সরকারের সত্যই কিছু ভুল-বোঝাবুঝি আছে। কোনো কোনো কারণে চীন-বিরোধী (প্রচার) অভিযান এখনও চলিবে। দুর্ভাগ্যবশত, তাহাই যদি হয়, তবু যাঁহাদের কোনো দুরভিসন্ধি নাই তাঁহাদেরও মনে চীন সম্বন্ধে ভুল-বোঝাবুঝি বেশিকাল বজায় থাকিবে, এমন কথা চীন সরকার কিছুতেই ভাবিতে চাহেন না। কেননা, চীন যদি ভারত বা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সত্যই আক্রমণ করিত, কিংবা বিপদ সৃষ্টি করিত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বার সে কথা অস্বীকার করিলেও ঘটনা ভিন্ন রূপ হইত না; অবস্থাটা অন্য রূপ হইলে, সহস্র প্রচার-যন্ত্র সারা পৃথিবীকে চীন হইতে "আক্রমণ" ও "বিপদের" কথা শুনাইলেও, উহার দ্বারা ঐ প্রচারকারীরা নিজেরাই অপদস্থ হইবে। "কতদুর চলে তাহা দিয়া জানা যায় ঘোড়ার ক্ষমতা কত; মানুষের অন্তর জানিতে হইলে সময় দরকার"।

ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ তাহা সময়ের মাধ্যমে পরীক্ষিত হইবে। কোনো বিষয়ে সত্য কিছুকাল গোপন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল গোপন রাখা অসম্ভব—এ বিষয়ে চীন সরকার নিশ্চিত।

(৫) চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন মীমাংসার মূল সূত্রটি কি?

সীমান্তের প্রশ্নে চীন ও ভারত সরকারের মনোভাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে; সীমান্ত লইয়া দুই দেশের মধ্যে এখনও উত্তেজনা রহিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনা যে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া যাইবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শাদির মারফতে সীমান্ত প্রশ্নের যুক্তিসম্মত মীমাংসায় পৌঁছান যাইবে, তাহাতে চীন সরকারের কখনও কোনো সন্দেহ ছিল না।

চীন সরকারের এই বিশ্বাসের ভিত্তি নিম্নরূপ : দুই দেশের মধ্যে হাজার-হাজার বছরের বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় এমন কোনো বিরোধ নাই; স্বদেশে দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ গঠনকর্মে ব্রতী হইবার জন্য উভয়পক্ষের জরুরি প্রয়োজন রহিয়াছে এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে কাজ করিতে উভয়পক্ষ ইচ্ছুক; এই প্রকার অন্তহীন বাদ-বিতণ্ডা বাঞ্ছনীয়ও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে—তাহা চিন্তাও করা যায় না। সীমান্তের প্রশ্নে, সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্তের বিরোধ মীমাংসা করিতে উভয়পক্ষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, চীন ও ভারতের একত্রে বন্ধুভাবে বসবাস করিবার ভিত্তি রহিয়াছে এবং যুক্তিসম্মত পন্থায় সীমান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়। তাহা ছাড়া, অন্য দিক হইতে দেখিলে, গত্যন্তরও নাই। উভয়পক্ষ যে পরস্পরের প্রতিবেশী, এই ভৌগোলিক বাস্তবতা পরিবর্তন করা কিংবা দীর্ঘ সীমারেখা বরাবর যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া উভয়পক্ষের ক্ষেত্রে অসম্ভব। একশত কোটির অধিক মিলিত জনসংখ্যা লইয়া আমাদের এই দুই মহান প্রতিবেশী বন্ধু দেশের মধ্যে এই রকমের একটি সাময়িক ও স্থানীয় বিরোধ লইয়া যুদ্ধ বাধাইবার উদ্ভট চিন্তা পোষণ করাও বিশেষভাবে অসম্ভব। অতএব, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত বিরোধের বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসাই একমাত্র যুক্তিসম্মত জবাব।

যে সকল মূল প্রশ্নের জরুরি সমাধান এখনই প্রয়োজন, সেগুলি কি? চীন-সরকার ভারত-সরকারের নিকট নিম্নলিখিত মতামত নিবেদন করিতেছেন :

(ক) চীন সরকারের মত এই যে, সীমান্ত সংক্রান্ত যে-কোনো নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া দুই পক্ষের মতামত যাহাই হউক না কেন, সারা পৃথিবীতে যাহা বিদিত সেই অতি মৌলিক তথ্যটি হইল এই যে, দুই দেশের মধ্যে সমগ্র সীমান্তটি যথার্থই কখনও নির্ধারিত হয় নাই; কাজেই আলাপ-আলোচনার মারফত উহা মীমাংসা করিবার কাজটি বাকি রহিয়াছে। এই সরল তথ্যটি মানিয়া লইলে কোনো পক্ষের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হইবে না, কেননা ইহাতে কোনো পক্ষের বর্তমান স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবে না, সীমান্ত লইয়া আলাপ-আলোচনাকালে উভয়পক্ষের নিজ নিজ দাবি উত্থাপন করিতেও কোনো প্রকার বাধা থাকিবে না। এই বিষয়ে একবার মতৈক্য হইয়া গেলেই ইহা বলা যায় যে, সীমান্ত প্রশ্নটির মীমাংসার পথ খুলিয়া গিয়াছে। সীমান্তের বিভিন্ন অংশ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিরোধগুলি সম্পর্কে দুই পক্ষ যদিও এখনও নিজ নিজ মত আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তবু দুই দেশের বন্ধুত্বের মৌলিক স্বার্থটিকে উভয়পক্ষ যদি গুরুত্ব দেয় এবং পক্ষপাতমুক্ত পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও মানাইয়া লওয়াইবার মনোভাব অবলম্বন যদি করে, তাহা হইলে এই সকল বিরোধের মীমাংসা করা কঠিন হইবে না। যদি দেখা যায়, ভারতের মতামত অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং অধিকতর পরিমাণে দুই দেশের বন্ধুত্বের স্বার্থানুযায়ী, তাহা চীনের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা উচিত; যদি দেখা যায় চীনের মতামত অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং

অধিকতর পরিমাণে দুই দেশের বন্ধুত্বের স্বার্থানুযায়ী, তাহা ভারতের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা উচিত। চীন সরকার আশা করেন যে, সীমান্তের প্রশ্নে দুই পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য ও সমস্যার একটা মীমাংসা স্থির করার জন্য যাহাতে একটি নির্দেশক নীতি ও ভিত্তি পাওয়া যায়, সেই রকমের কোনো কোনো নীতি স্থির করার বিষয়ে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় আগামী বৈঠকের মধ্য দিয়া প্রথমেই একটা মতৈক্যে পৌঁছিবেন।

(খ) সীমান্ত যতদিন বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হইতেছে না, ততদিন দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে স্থিতাবস্থা কার্যকরভাবে বজায় রাখিতেই হইবে এবং সীমান্তে শান্ত অবস্থা সুনিশ্চিত করিতে হইবে। চীন সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিতেছেন যে, সীমান্ত বরাবর দুই দেশের সশস্ত্র শক্তি ২০ কিলোমিটার করিয়া কিংবা উভয়পক্ষের দ্বারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় এমন অন্য কোনো পরিমাণ দূরত্বে সরাইয়া লওয়া হউক এবং এই মৌলিক ব্যবস্থাটির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উভয়পক্ষের সশস্ত্র লোকলস্কর সমগ্র সীমান্ত বরাবর টহলদারি বন্ধ করুন।

চীন সরকার মনে করেন যে, উল্লিখিত দুইটি বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছান গেলে, চীন-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতিতে অবিলম্বে পরিবর্তন ঘটিবে এবং দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-কালো মেঘ জমিয়া রহিয়াছে, তাহা দ্রুত কাটিয়া যাইবে।

চীন-ভারত সীমান্তের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখানে সবিস্তারে যে মতামত উপস্থিত করা হইল, তাহা ভারত সরকার বিশেষ শুভেচ্ছার সহিত বিবেচনা করিবেন এবং উভয়পক্ষের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পন্থায় প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য ও দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য তাহা সহায়ক হইবে, ইহাই চীন সরকারের আন্তরিক আশা। অন্যান্য অভিযোগের জবাবে কিছু কিছু বাদ-বিসংবাদ না করিয়া যদিও উপায় নাই, তবু বাদ-বিসংবাদ করা নহে—বাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটানোই হইতেছে চীন সরকারের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য।

চীন ও ভারত দুইটি মহান দেশ; উভয়েরই রহিয়াছে মহান অতীত ও ভবিষ্যৎ। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীলের মহান আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুই দেশ গত কয়েক বৎসর বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে হাত মিলাইয়াছে এবং ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়াছে। আজ দুই দেশের জনগণের প্রতি আবার ইতিহাসের আহ্বান আসিয়াছে; স্বদেশে বিপুল পরিবর্তন সাধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও মানব-প্রগতির আদর্শে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বৃহৎ বৃহৎ অবদানের জন্য এই আহ্বান আসিয়াছে। চীন ও ভারতের বর্তমানের জনগণের উপর যে-কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহা যেমন কঠিন, তেমনি গৌরবময়। চীন সরকার তাঁহাদের প্রবল কামনা এখানে পুনর্বার ব্যক্ত করিয়া বলিতে চাহেন যে, দুই দেশ বিবাদ বন্ধ করুন, সীমান্ত প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত মীমাংসা দ্রুত ঘটনা এবং ইহার ভিত্তিতে দুই দেশের জনগণের সম-স্বার্থে মহান বন্ধুত্ব সংহত ও বিকশিত করিয়া তুলুন।

চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী-বিভাগ চীনে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতাবাসের প্রতি এই সুযোগে পুনর্বার সর্বোচ্চ বিবেচনার নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পিকিং, ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯

টিকা :

১) এই সহায়ক তথ্যের চিঠিগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিগুলি ছাড়াও আরও অনেক চিঠির সমাহার যা পশ্চিমবঙ্গের পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল মূল ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিবেশন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে 'ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কে নেহরু-চৌ এন-লাই পত্রাবলী' শিরোনামে যা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি দৈনিক যুগান্তর ও স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য যা ছিল মূল ও পূর্ণাঙ্গ চিঠির সংক্ষেপিত অংশবিশেষ। আগ্রহী পাঠকের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য আমরা মূল ও পূর্ণাঙ্গ চিঠি বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত করলাম।

২) বর্তমান খণ্ডে অতিরিক্ত আরও কয়েকখানি চিঠি রয়েছে যা একই শিরোনামে অনিল বিশ্বাসের বইয়ে অনুপস্থিত। যেমন—

ক) ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পত্রের সংযোজন। এই সংযোজনে রয়েছে সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য-লিপি।

খ) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের পত্র, ৭ নভেম্বর, ১৯৫৯।

গ) চীনের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত শ্রীনেহরুর পত্র, ১৬ নভেম্বর, ১৯৫৯।

ঘ) শ্রীনেহরুর ১৬ নভেম্বরের পত্রের জবাবে চৌ এন-লাইয়ের পত্র ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

ঙ) চৌ এন-লাইয়ের পত্রের জবাবে শ্রীনেহরুর পত্র, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

চ) চীনে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতাবাসে প্রদত্ত চীনের পররাষ্ট্র বিভাগের মন্তব্য-লিপি, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

এই সমস্ত পত্রাবলী ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কের সমস্যাবলী বুঝতে সকলকেই সাহায্য করবে।

৩) উভয় দেশের সীমান্ত বহু স্থানে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত না হলেও, চিরাচরিত একটা প্রচলিত সীমারেখার অস্তিত্ব ছিল যা সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগের পথ, বাণিজ্যের পথ, জল বিভাজিকার অস্তিত্ব, পৃথক পৃথক জরিপ কার্যের মধ্যদিয়ে। তাই দুইদেশের মানচিত্রে বিভিন্ন সময়ে সীমান্তরেখার তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

৪) কার্যকরীভাবে সীমান্ত সমস্যা নির্ধারণ উভয়দেশের বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন: ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস, এতদঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি, স্থানীয় ভাষা, পররাষ্ট্র দপ্তর, সরকারি সার্ভে দপ্তর প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ দলের যৌথ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

৫) পঞ্চশীল নীতির রূপকার এই দুই দেশই সেই নীতিগুলির ওপর বিশ্বাস রেখেই আলোচনা চালাবে।

(—সম্পাদক)

ভারত-চীন বিরোধ সম্পর্কে
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব

[২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৯৫৯ সাল —সম্পাদক) কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত]

সাম্প্রতিক কয়েক মাসে ভারত ও চীনের পারস্পরিক সম্পর্কে যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। কমিটি বিশেষ করিয়া সম্প্রতি যে সকল দুর্ভাগ্যজনক সীমান্ত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং দুই দেশের মধ্যে যে বিরোধ ঘটিয়াছে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি কেবল ভারতীয় জনগণের পক্ষেই নহে এশিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের পক্ষেই উদ্বেগজনক— কারণ ভারত-চীন মৈত্রী আফ্রিশীয় সংহতি ও স্বাধীনতার শক্তিশালী স্তম্ভস্বরূপ। এই মৈত্রীকে কোন প্রকারে দুর্বল করিলে উহা বিশ্ব-শান্তির শক্তিসমূহের পক্ষে গুরুতর আঘাতস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলগুলি এই সকল ঘটনাকে দারুণভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া এশিয়ার বৃহত্তম দুইটি দেশের মধ্যে সন্দেহের আবহাওয়া এবং উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া যাঁহাদের মৈত্রী অব্যাহত ছিল সেই একশত কোটি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবিষয়ে ওয়াকিবহাল আছে যে, বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে কখনও সঠিক ধরনে সার্ভে না হওয়া ও সীমান্তচিহ্নিত না হওয়ায় এবং ভারত স্বাধীন হইবার পর ও চীনে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এ সমস্যার মোকাবিলা করিয়া দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা না হইবার ফলে উভয়দেশের মধ্যে সীমান্ত রেখা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে ইহাও স্বীকৃত সত্য। কিন্তু একদিকে ম্যাকমোহন লাইন এবং অপর পক্ষে চীনের মানচিত্র মানিয়া লওয়াকে আপস আলোচনা আরম্ভের পূর্ব শর্তরূপে খাড়া না করিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সকল মতপার্থক্য দূর করা সম্ভব।

দুই দেশের প্রতিনিধিদের বিবৃতিতে ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার ভিত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

চীনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১৯৫৯ সালের ২০ মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন : "আমি স্বীকার করি যে, এই সাম্প্রতিক বিরোধগুলি দেখা

দিবার পূর্বে যে অবস্থান ছিল উহাকে উভয় পক্ষেরই মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং নিজে যাহা ন্যায্য বলিয়া মনে করেন তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া কোনও পক্ষেরই একতরফা ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা না করাই কর্তব্য।"

আর সম্প্রতি, ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের দ্বিতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতেও অনুরূপ মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "...সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে দুই পক্ষেরই বহুকালের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, একতরফা ব্যবস্থা দ্বারা উহাকে বদল করিবার চেষ্টা না করা এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাহা করিবার চেষ্টা আদৌ না করাই কর্তব্য; আর সীমান্ত অঞ্চলের শান্তি ও উভয় দেশের মৈত্রী বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি বিরোধের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এক একটি স্থান সম্পর্কে সাময়িক চুক্তিও করা যাইতে পারে।..."

প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং চীনের দ্বিতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির এই গঠনমূলক মনোভাবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কমিটি এবিষয়ে নিশ্চিত যে, এই মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং এই নীতি অনুযায়ী যখনই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হইবে তখনই পরিস্থিতির উন্নতি হইবে এবং ফলে সীমান্ত সমস্যার সমাধান হইতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি আবার দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করিবার ব্যাপারে আমাদের পার্টি দেশের জনগণের সহিত একত্রে দাঁড়াইবে এবং উহাকে রক্ষা করিবার ব্যাপারে কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। তবে কমিটি এবিষয়েও নিশ্চিত যে, সামাজতন্ত্রী চীন ভারতের বিরুদ্ধে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না— যেমন চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার কোনও ইচ্ছা আমাদের দেশের নাই।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছে যে, এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগাইয়া বিদেশে মার্কিন ও অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি ভারতকে উহাদের জালে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছে। দেশের মধ্যে, পি-এস-পি, জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির মত দলগুলির চরম প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দও পঞ্চশীল ও ভারতের সমগ্র নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে— যাহা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে বহুল পরিমাণে সংহত করিয়াছে এবং বিশ্ব-শান্তির সপক্ষে শক্তিশালী উপকরণ জুগাইয়াছে— সেই নীতিকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা কিছু আকস্মিক বিষয় নহে যে, আমাদের দেশের বৈদেশিক নীতির চিরশত্রুগণই ভারত-চীন মৈত্রীর বিরুদ্ধেও সর্ববিধ উগ্র প্রচার করিতেছে। তাহা ছাড়াও ভারত-চীন সম্পর্কের এই দুঃখজনক পরিণতিকে ইচ্ছা করিয়াই অতিরঞ্জিত করা হইতেছে এবং জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি সরাইয়া দিতে, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ও দমন করিতে, যে কমিউনিস্ট পার্টি আজ গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের পুরোভাগে শক্তিশালী ঐক্যসংগঠকরূপে দাঁড়াইয়া আছে এবং জনগণের অধিকার এবং স্বার্থের ও রক্ষক উহার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কাইয়া দিবার ব্যাপারেও ইহাকে কাজে লাগানো হইতেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অভিমত এই যে, ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তিব্বত প্রশ্ন লইয়া। সমস্ত রকমের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করিয়া

এবং আশ্রয় দানের যে সুযোগ উহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহার অপব্যবহার করিয়া দলাই লামা এবং তাঁহার অনুসঙ্গীগণ যে সকল কার্যকলাপ করিয়াছেন তাহা পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। দলাই লামা এবং তাঁহার অনুসঙ্গীগণ এমন কি ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া এমনভাবে আচরণ করিতেছেন যেন তাঁহারা একটি শরণার্থী সরকার। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি দুঃখিত যে, দলাই লামার এই সকল কার্যকলাপ সুস্পষ্টভাবেই ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অবসান ঘটানো হইতেছে না।

সীমান্ত বিরোধের ঘটনাবলীকে অতিরঞ্জিত করিয়া যুদ্ধ-মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা সম্পর্কে জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি হুঁশিয়ারি জানাইতেছেন। দেশে যুদ্ধ-মনোভাব সৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রধানমন্ত্রী যে আবেদন জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি উহাকে সমর্থন করিতেছেন— ভারত-চীন মৈত্রী ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সুপরিকল্পিতভাবেই যুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করিতেছে।

স্বাধীনতা, প্রগতি ও শান্তি যাহাদের কাম্য তাঁহাদের সকলের পক্ষেই এখন এক পরীক্ষামুহূর্ত সমুপস্থিত। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বিশ্বমানবের পক্ষে এত মূল্যবান এই মৈত্রীর শত্রুদের একেবারেই আমল না দেন, উপরন্তু এই মৈত্রীর পথে যে সকল শোচনীয় অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য যেন তাঁহারা চেষ্টা করেন।

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃক প্রকাশিত]